বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা

[Armed Women Fighters in the Liberation War of Bangladesh]

লাবনী ইসলাম চুমকী

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন নম্বরঃ ১৭, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৮-১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন, ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা

[Armed Women Fighters in the Liberation War of Bangladesh]

লাবনী ইসলাম চুমকী

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন নম্বরঃ ১৭, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৮-১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন, ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা

[Armed Women Fighters in the Liberation War of Bangladesh]

এই অভিসন্দর্ভটি
এম.ফিল (M.Phil) ডিগ্রি অর্জনের জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ
(মেসবাহ কামাল)
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

গবেষক

লাবনী ইসলাম চুমকী
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর: ১৭, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রির উদ্দেশ্যে লাবনী ইসলাম চুমকী-এর দাখিলকৃত '*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা*' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া হয় নাই। অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি আমি পাঠ করেছি এবং তা এম.ফিল ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়ার সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ
(মেসবাহ কামাল)
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা*** শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভে তথ্যসূত্রে উল্লিখিত তথ্য, উদ্ধৃত আলোচ্য ও উপাত্ত ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থের অনুকরণে রচনা করা হয়নি। এই গবেষণা বা এর অংশবিশেষ পূর্বে প্রকাশিত হয়নি বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য অন্য কোথাও আমি উপস্থাপন করি নাই।

গবেষক

লাবনী ইসলাম চুমকী
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর: ১৭, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগের অধীনে *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা* শীর্ষক আমার এম.ফিল গবেষণা-কর্মটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষক

লাবনী ইসলাম চুমকী
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর: ১৭, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত মাতা

জনাব নাজমা বেগম

যিনি আমাকে বাল্যকাল থেকে আগ্রহ সহকারে পড়াশুনা করে একজন শিক্ষিত ও আদর্শ মানুষ হবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন

এবং

যাঁরা আমার জীবনের নতুন দিক উন্মোচনে সহায়তা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা* শীর্ষক আমার এম.ফিল গবেষণা যাঁর দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় এগিয়েছে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল। গবেষণা শুরুর প্রথম দিন থেকে যিনি পরমযত্নে সন্তান স্নেহে গবেষণাকর্মে সর্বদা পাশে থেকেছেন। গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে ভুলগুলোকে শুধরে দিয়েছেন। সময়ে অসময়ে আমার প্রয়োজনে যখনই যোগাযোগ করেছি তখনই আমাকে শত ব্যস্ততার মাঝে সহযোগিতা করেছেন। যতবার ভুল করেছি সংশোধন করে দিয়েছেন। কিভাবে বুক রিভিউ ও সমীক্ষা করতে হয়; আর্কাইভস-এ কাজ করতে হয়; কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে তথ্য সংগ্রহ সহজতর হয় সেসব দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। লেখার সময় কোন কোন বিষয়ের উপর জোর দিতে হয় সে বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে শিখিয়েছেন। সর্বোপরি, তিনি একজন বড় মাপের মানুষ। তিনি বাংলাদেশের প্রান্তিক জন-মানুষ নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও অকৃত্রিম সহযোগিতা ব্যতিত এই গবেষণার ব্যঞ্জনা ভিন্নতর হতো। তাই পরম শ্রদ্ধেয় এই তত্ত্বাবধায়কের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

এর পরেই ধন্যবাদ জানাতে চাই ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সানিয়া সিতারা ম্যাডামকে। তিনি গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধযোগ্য।

গবেষণার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে আমি স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব সেকেন্দার আলী মোল্যা, প্রয়াত মাতা মিসেস নাজমা বেগম, খালা সালমা আক্তার, বড় বোন সুমা পারভীন, মেজ বোন মুন্নী খাতুন এবং ছোট বোন খাদিজা ইসলাম রুমকিকে। তাঁরা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণায় উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের অনুপ্রেরণা ছাড়া কখনই বর্তমান গবেষণাকর্ম সাফল্য লাভ করত না, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া, আমার জীবনসঙ্গী মোঃ মামুন-অর-রশিদ আমাকে সংসারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি সর্বদা আমার গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস (সাক্ষাৎকার) সংগ্রহকালে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা, লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহ করে এবং অনুলিপি তৈরি করে সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি, গবেষণা কর্মে সহায়তাকারক মোঃ সাহিরুজ্জামান এবং মোঃ রকিবুল ইসলামকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার তথ্য আহরণের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের সেমিনার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের দায়িত্বে যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি, অভিসন্দর্ভের বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে যারা আমাকে সাক্ষ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্ণেল সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক), জনাব আরমা দত্ত (এম.পি), মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য, মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সাত্তার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সোলায়মান মৃধা, মুক্তিযোদ্ধা প্রভাত রায়, মিসেস জয়া তাসনিম রহমান (কন্যা, শিরিন বানু মিতিল) এবং জনাব মোঃ নাইমুদ্দিন নান্নু (পুত্র, বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিন)-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

লাবনী ইসলাম চুমকী
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর: ১৭, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ঘোষণাপত্র	**IV**
মুখবন্ধ	**VII**
প্রথম অধ্যায় : উপক্রমণিকা	**০২**
১.১ প্রাককথন	০৩
১.২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা: তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধান।	০৫
১.৩ গবেষণার বিভিন্ন দিক	১০
১.৩.১ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১০
১.৩.২ প্রাসঙ্গিক গবেষণাসমূহের পর্যালোচনা	১০
১.৩.৩ গবেষণার পরিধি	১৩
১.৩.৪ গবেষণা পদ্ধতি	১৩
১.৪ অধ্যায় বিভাজন	১৪
১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৬
১.৬ পরিশেষ	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত সশস্ত্র নারীযোদ্ধা তারামন বিবি (বীরপ্রতীক)	**১৮**
২.১ তারামন বিবি	১৯
২.২ জন্ম ও বেড়ে ওঠা	২০
২.৩ একাত্তরের রণাঙ্গনে তারামন বিবি	২১
২.৩.১ রাঁধুনি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান	২১
২.৩.২ অস্ত্র প্রশিক্ষণ	২২
২.৩.৩ গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ	২৩
২.৩.৪ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন	২৪
২.৪ একাত্তর পরবর্তী জীবন	২৬

২.৫ আত্মোপলব্ধি ২৮
২.৬ শেষজীবন ৩১
২.৭ পরিশেষ ৩২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধে আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি ৩৪

৩.১ কাঁকন বিবি ৩৫
৩.২ জন্ম ও বেড়ে ওঠা ৩৫
৩.৩ একাত্তরের রণাঙ্গনে কাঁকন বিবি ৩৮
৩.৩.১ তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ৪০
৩.৩.২ গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ ৪৩
৩.৩.৩ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন ৪৪
৩.৪ একাত্তর পরবর্তী জীবন ৪৫
৩.৫ আত্মোপলব্ধি ৪৬
৩.৬ শেষজীবন ৪৮
৩.৭ পরিশেষ ৫০

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ৫২

৪.১ আশালতা বৈদ্য ৫৩
৪.২ জন্ম ও বেড়ে ওঠা ৫৩
৪.৩ একাত্তরের রণাঙ্গনে আশালতা বৈদ্য ৫৬
৪.৩.১ মহিলা গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ৫৮
৪.৩.২ একাত্তরের রণাঙ্গনে বিভিন্ন অপারেশন ৬০
৪.৪ একাত্তর পরবর্তী জীবন ৬৩
৪.৫ আত্মোপলব্ধি ৬৪
৪.৬ পরিশেষ ৬৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ **৬৮**

স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরুষবেশী নারী মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল এবং করুনা বেগম **৬৯**

৫.১ শিরিন বানু মিতিল ৬৯

৫.১.১ জন্ম ও বেড়ে ওঠা ৬৭

৫.১.২ একাত্তরের রণাঙ্গনে শিরিন বানু মিতিলের জীবনযাপন ৭৩

ক. পাবনার প্রাথমিক প্রতিরোধে পুরুষবেশে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল ৭৩

খ. টেলিফোন ভবনের যুদ্ধ ৭৪

গ. কন্ট্রোল রুম ও অন্যান্য অপারেশন ৭৪

ঘ. কলকাতার গোবরা ক্যাম্পে শিরিন বানু মিতিল ৭৬

৫.১.৩ একাত্তর পরবর্তী জীবন ৭৯

৫.১.৪ আত্মোপলব্ধি ৮১

৫.১.৫ শেষজীবন ৮৩

৫.২ করুনা বেগম ৮৪

৫.২.১ জন্ম ও বেড়ে ওঠা ৮৫

৫.২.২ একাত্তরের রণাঙ্গনে করুনা বেগম ৮৬

ক. স্বামী হত্যার প্রতিশোধে পুরুষবেশে নারী মুক্তিযোদ্ধা ৮৭

খ. অস্ত্র প্রশিক্ষণ ৮৭

গ. হ্যান্ড গ্রেনেড দক্ষতায় বিভিন্ন অপারেশন ৮৮

ঘ. যুদ্ধাহত নারী মুক্তিযোদ্ধা ৮৯

৫.২.৩ একাত্তর পরবর্তী জীবন ৯০

৫.২.৫ শেষজীবন ৯৩

৫.২.৬ পরিশেষ ৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের দুইবোনঃ মুক্তিযোদ্ধা এস এম মনোয়ারা বেগম এবং মুক্তিযোদ্ধা এস এম আনোয়ারা বেগম **৯৭**

৬.১ জন্ম ও বেড়ে ওঠা ৯৭

৬.২ রাজনৈতিক জীবন ৯৭
৬.৩ একাত্তরের রণাঙ্গনে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম ১০০
৬.৩.১ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ১০১
৬.৩.২ মুক্তিযুদ্ধের অভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবে জীবন ১০২
৬.৩.৩ গেরিলা প্রশিক্ষণ ১০২
৬.৩.৪ অস্ত্র প্রশিক্ষণ ১০৩
৬.৩.৫সেন্ট্রি (ক্যাম্প পাহাড়া) ১০৩
৬.৩.৬ রেকি ১০৩
৬.৩.৭ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন ১০৩
৬.৪ একাত্তর পরবর্তী জীবনযাপন ১০৫
৬.৫ আত্মোপলব্ধি ১০৭
৬.৬ শেষজীবন ১০৮
৬.৭ পরিশেষ ১০৯

সপ্তম অধ্যায়: স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র নারীসমাজ: কয়েকটি কেস-স্ট্যাডি ১১০

৭.১ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্ব প্রসঙ্গ ১১১
৭.১.১ মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ১১১
৭.১.২ মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ বেগম ১১৬
৭.১.৩ মুক্তিযোদ্ধা ফোরকান বেগম ১২০
৭.২ মুক্তিযোদ্ধা স্বর্ণলতা ফলিয়া ১২৫
৭.৩ আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ ১২৭
৭.৪ একাত্তরের রণাঙ্গনে বরিশালের পেয়ারা বাগান: সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা ১২৯
৭.৫ আত্মোপলব্ধি ১৩৩
৭.৬ পরিশেষ ১৩৪

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ১৩৬

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ১৪০

মানচিত্র তালিকা ১৫১

মানচিত্র-১: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি।

মানচিত্র-২: ১৯৭১ সালের অপারেশন সার্চলাইটে বাঙালি এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান।

মানচিত্র-৩: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অবস্থান 'অপারেশন জ্যাকপট' ।

মানচিত্র-৪: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবস্থান।

মানচিত্র-৫: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১ টি সেক্টর।

মানচিত্র-৬: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান সামরিক ইউনিট এবং মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধ।

সারণি তালিকা ১৫৮

সারণি-১ : সশস্ত্রযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের তালিকা

পরিশিষ্ট তালিকা ১৬৬

পরিশিষ্ট-১: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট-২: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লিখিত পুরুষ ছদ্মবেশে নারী মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহত করুনা বেগমের প্রতি অভিনন্দন পত্র

পরিশিষ্ট-৩: সাক্ষাৎকার স্থান ও সাক্ষাৎকার পর্বের স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট-৪: মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি (বীরপ্রতীক) সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট-৫: মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট-৬: মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট-৭: মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট-৮: মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অন্যান্য স্থিরচিত্র

গবেষণার সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ছিল বহুমাত্রিক। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে শুরু করে সর্বাত্মক যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সাহসী ও তাৎপর্যপূর্ণ। কখনো প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন আবার কখনো পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বস্তুত, আমাদের মূলধারার ইতিহাসে নারীদের সশস্ত্র ভূমিকা অবহেলিত এবং সর্বোপরি অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ, অর্ধ-সত্য ও খণ্ডিত-ইতিহাস একটি জাতির সামনে চলার পথে ক্ষণেক্ষণেই বাঁধার কন্টক হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। যতদিন ১৯৭১ এর যুদ্ধকালীন বাংলায় নারীদের সশস্ত্র অবস্থান সংযোজিত না হবে, ততদিন মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাস থাকবে অপূর্ণ। তাই বর্তমান গবেষণাকর্ম "*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা*" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে নারীকে শুধু নারী হিসেবে নয়, মানব সমাজের অংশ হিসেবে, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসে দৃশ্যমান ও মূলধারায় সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমত, এই গবেষণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, Joan Kelly প্রদত্ত নারীর ইতিহাস রচনার তত্ত্বগত কাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, গবেষণার বিভিন্ন দিক, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিক গবেষণাসমূহের পর্যালোচনা, গবেষণার পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি, কাঁকন বিবি, আশালতা বৈদ্য; পুরুষ ছদ্মবেশী নারী মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল ও করুনা বেগম; মুক্তিযুদ্ধের দুই বোন এস এম মনোয়ারা বেগম ও এস এম আনোয়ারা বেগম; বরিশালের পেয়ারা বাগান অঞ্চলের সশস্ত্র নারীযোদ্ধা বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা ও শাহানা পারভীন শোভা; একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্ব প্রসঙ্গে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এবং মমতাজ বেগম; মুক্তিযোদ্ধা স্বর্ণলতা ফলিয়া এবং প্রিনছা খেঁ সম্পর্কে এই গবেষণায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষত, একাত্তরের রণাঙ্গনে নারীদের সশস্ত্র অবস্থান ও ভূমিকার দিকটি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে, একাত্তরের রণাঙ্গনে বীরপ্রতীক তারামন বিবি স্বীয় কুড়িগ্রাম জেলার নদী-তীরবর্তী অঞ্চল মোহনগঞ্জ, তারাবর, কোদালকাটি ও গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়িতে অগ্রবর্তী দলের হয়ে যে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া, তারামন বিবির নির্ভয়ে ও দক্ষতার সাথে গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ হিসেবে খাড়িয়াভাঙ্গা ও ভেলামারি খাল এলাকায় পাকিস্তানি ঘাঁটির অবস্থান সম্পর্কে তাঁর সংগৃহীত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত সফল অভিযান তুলে ধরা হয়েছে। বীরযোদ্ধা কাঁকনবিবির ৪ নং সেক্টরের অধীনে সংগঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, তাঁর টেংরাটিলা যুদ্ধ, আমবাড়ি, বাংলাবাজার, টেবলাই, বালিউরা, মহব্বতপুর, বেতুরা, দুর্বিনটিলা, আধারটিলার সম্মুখ যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শিরিন বানু মিতিল পুরুষ ছদ্মবেশ ধারণ করে সেক্টর ৯-এর মেজর এম এ জলিলের অধীনে ২৭ মার্চ রাতে পাবনা পুলিশ লাইনের যুদ্ধে, ২৮ মার্চ পাবনা টেলিফোন ভবনের যুদ্ধে, পাবনার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে অবদান রেখেছিলেন সেই বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, মুক্তিযোদ্ধা করুনা বেগম কিভাবে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে ৯ নং সেক্টরের অধীনে বরিশালের দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল জেলা সদর, কসবা, কাশিমাবাদ, বাটাজোর, নন্দীবাজার, টরকীতে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেন সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ও তাঁর সহযোদ্ধা স্বর্ণলতা ফলিয়ার হরিণাহাটি, কোটালীপাড়া, শিকের বাজার, রামশীল ও ঘাঘর বাজারে সম্মুখ যুদ্ধ সম্পর্কে অলোকপাত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগমের বরিশালের তুষখালি, মোড়লগঞ্জের রায়েন্দা, সুন্দরবন, ডোবাতলা, শরণখোলা, নামাযপুর, কাকচিড়ায় ও ফাতরার চর অপারেশন বর্ণনা করা হয়েছে।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ও মমতাজ বেগমের সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যক্রম সমন্বয় সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বোপরি, মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ বরিশালের বাউখালি ক্যাম্পে কিভাবে বিষ মিশ্রিত খাবার দ্বারা বহু পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করেন সেই বিষয়টি এই গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে।

উপসংহারে রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের সশস্ত্র অবস্থান ও ভূমিকার মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোর সারমর্ম তুলে ধরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধার অবদান অন্বেষণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা

[Armed Women Fighters in the Liberation War of Bangladesh]

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

অধ্যায়-১

উপক্রমণিকা

১. প্রাককথন

বর্তমান বাংলাদেশ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যা তৎকালীন সময়ে "পূর্ব বাংলা" নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে তা "পূর্ব পাকিস্তান" নাম ধারণ করে এক চূড়ান্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে "বাংলাদেশ" নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলার এই স্বাধীনতা যুদ্ধ তাৎক্ষণিক কোন ঘটনা ছিল না। সুদীর্ঘ নয় মাস যাবৎ এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল এই স্বাধীনতা, যেখানে বাংলার নারীসমাজ পিছিয়ে ছিল না। নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সাহসী ও তাৎপর্যপূর্ণ। বীরপ্রতীক তারামন বিবি, কাঁকন বিবি, আশালতা বৈদ্য, শিরিন বানু মিতিল, করুনা বেগম, এস এম মনোয়ারা বেগম, এস এম আনোয়ারা বেগম, বিথীকা বিশ্বাস, শিশির কণা, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম, স্বর্ণলতা ফলিয়া এবং প্রিনছা খেঁ সহ নাম না জানা আরও অনেক নারী রণাঙ্গনে অসম সাহসিকতার সাথে বীরদর্পে যুদ্ধ করেছেন।

বীরপ্রতীক তারামন বিবি কুড়িগ্রামের শঙ্কর মাধবপুর স্বীয় গ্রামের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। রাঁধুনি থেকে হয়ে ওঠা নির্ভীক তারামন বিবি পাগলীর বেশে ছেঁড়া বেশভূষা নিয়ে চলে যেতেন পাকিস্তানি ক্যাম্পে খবর আনতে। এক্ষেত্রে, তিনি সারা শরীরে কাদামাটি, চক, কালি এমনকি মানুষের বিষ্ঠা পর্যন্ত লাগিয়ে পাগল সেজেছেন, চুল এলোমেলো করে বোবা সেজে দীর্ঘক্ষণ হাসি আর কান্নার অভিনয় করেছেন পাকিস্তানি বাহিনীর সামনে। এভাবে নানান বেশে জান-মানের ভয় না করে, কেবল দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তারামন বিবি পাকিস্তানি বাহিনীর তথ্য নিয়ে আসতেন। পরবর্তীকালে, তিনি অস্ত্র চালনাসহ স্টেনগান হাতে নিয়ে আলফা প্রশিক্ষণ নেন, যা এক ধরনের যুদ্ধ কৌশল। মূলত, তিনি তৎকালীন রৌমারী থানা এলাকায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে অংশ নেন।

বীরযোদ্ধা কাঁকনবিবি ৪ নং সেক্টরের অধীনে সংগঠিত যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে টেংরাটিলায় পাকিস্তানি সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধে তাঁর দেহ গুলিবিদ্ধ হয়। টেংরাটিলা

যুদ্ধের পর আমবাড়ি, বাংলাবাজার, টেবলাই, বালিউরা, মহব্বতপুর, বেতুরা, দুর্বিনটিলা, আধারটিলার সম্মুখ যুদ্ধে কাঁকন বিবি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে সেক্টর ৯-এ মেজর এম এ জলিলের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন। তিনি ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল নগরবাড়ির যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা করুনা বেগম পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে ৯ নং সেক্টরের অধীনে বরিশালের বামরাইল, কাশিমাবাদ, বাটাজোর, নন্দীরবাজার, টরকী এবং মাহিলারাসহ বরিশালের বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আশালতা বৈদ্য ও স্বর্ণলতা ফলিয়া একাধিক যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁরা হরিণাহাটি, কোটালীপাড়া, শিকের বাজার, রামশীল ও ঘাঘর বাজারে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম বরিশালের তুষখালি, মোড়লগঞ্জের রায়েন্দা, সুন্দরবন, ডোবাতলা, শরণখোলা, নামাযপুর, কাকচিড়া ও ফাতরার চর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম ও ফোরকান বেগম সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যক্রম সমন্বয় করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সর্বোপরি, মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ বরিশালের বাউখালি ক্যাম্পে বিষ মিশ্রিত খাবার দ্বারা বহু পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করেন। প্রত্যেকটি বিষয় এই অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সশস্ত্র নারীযোদ্ধার ভূমিকা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ব্যতিক্রম ছাড়া নারীদের বীরত্বের কথা এবং তাঁদের দুঃসাহসের ইতিহাস, আজও মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গভীর অতলে বরফের মতো জমে আছে। এজন্য ইতিহাসের সত্যদৃষ্টি দরকার।

আর এই বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধাদের অবস্থান, প্রতিরোধের স্বরূপ এবং স্বাধীনতা অর্জনে সশস্ত্র নারীযোদ্ধাদের প্রভাব ও তাঁর মূল্যায়ন বর্তমান অভিসন্দর্ভে অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা: তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের প্রকৃত অবস্থান বিকৃত ইতিহাস থেকে উদ্ধার করে মুক্তিযুদ্ধের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। কোনো সহযোগী ভূমিকায় নারীর আংশিক ইতিহাস তুলে ধরা এই গবেষণার লক্ষ্য নয়, বরং নারীর সশস্ত্র ভূমিকা কীভাবে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে, নারীকে সশস্ত্র সংগ্রামের যোদ্ধা হিসেবে কীভাবে অস্বীকার করা হয়, কীভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে নারী শুধু ধর্ষিতা পরিচয়ের কারণে সমাজ ও পরিবারের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যায়, সেসব দিক অনুসন্ধান করা এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে বৈষম্যগত দৃষ্টিভঙ্গি। রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে সেই একই প্রভাব ক্রিয়াশীল। সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি ঠিক করে দেয় নারী কী ভূমিকা পালন করবে। নারী সেই সীমা ও গণ্ডি ছাড়িয়ে উত্তরোত্তর নতুন নতুন ভূমিকা পালন করলেও তা স্বীকার করা হয় না। এই প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র নারীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস রচিত হয়েছিল বিংশ শতকের সত্তর-আশির দশকে ইউরোপে। এই ইতিহাস রচয়িতারা অনুসরণ করেছিলেন ইংরেজ মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ ক্রিস্টোফার হল, অ্যাডওয়ার্ড টমসন ও এরিক হবসবমকে। এর ফলে ইতিহাস রচনায় বাদ পড়ে যাওয়া অনেক ঘটনা ও ব্যক্তির অবদানের কথা জানতে পারা গিয়েছিল। তবু সমস্যা কিছুটা থেকেই গিয়েছিল। কারণ, উল্লেখিত ইতিহাসবেত্তাদের রচনায় কেবল উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি ও তাঁদের কীর্তির কথা প্রাধান্য পেয়েছিল। সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা গিয়েছিল নারীর যথার্থ অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে।[১]

Joan Kelly[২] নারীর ইতিহাস রচনার তত্ত্বগত কাঠামো নিয়ে গভীর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'নারীর ইতিহাস প্রত্যয়টির দুটি লক্ষ্য মাত্রা রয়েছে'। যথা:

- ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় নারীকে নিয়ে আসা

[১] সায়মা খাতুন, 'নারীবাদী ইতিহাস রচনার সঙ্কট', বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৪ বিশেষ সংখ্যা: বাংলাদেশের বহুকণ্ঠ, নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪।

[2] Joan Kelly, `The Social Relation of the Sexes: Methodological Implications of Women's History', Catharine R. Stimpson (ed), *Women, History and Theory: The Essays of Joan Kelly*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1986, page: 1-18.

(to restore Women to history)

- ❖ আমাদের ইতিহাস রচনাকে নারীর কাছে নিয়ে যাওয়া

  (to restore our history to Women)

এক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক চিন্তার তিনটি মৌলিক বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন Joan Kelly।

আর সেই তিনটি বিষয় হলো:

- ❖ ঐতিহাসিক কাল বিভাগ

  (periodization)

- ❖ সামাজিক বিশ্লেষণের পর্ব

  (the categories of social analysis)

- ❖ সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

  (theories of social change)

মূলত, এই তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণ করেই গবেষণা করা হয়েছে *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি।

সমাজের অর্ধাংশ নারী এবং নারীর অবস্থা ও অবস্থান একটি সামাজিক বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। কিন্তু আমরা আর্থ-সামাজিক, সাংবিধানিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অধ্যয়ন করতে গিয়ে দেখতে পাই, নারীকে পূর্ণ নাগরিক ও সমাজের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ইতিহাসের সেই সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে নারী অদৃশ্য হয়ে যায়।[৩]

এ প্রসঙ্গে তত্ত্ব হিসেবে Joan Kelly প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই সত্যটি যে,

> বিভিন্ন সময়কাল অথবা বিরাট আকারের সামাজিক পরিবর্তন সাধনকারী আন্দোলনগুলোকে দেখতে হবে নারীর স্বাধীনতা ও নিপীড়নের আলোকে। নারীর মানবতার অগ্রগতি ঘটানোর জন্য, সেই সঙ্গে পুরুষের জন্যেও সেসব কাজ ও আন্দোলন কী বয়ে এনেছে তার আলোকে। যে মুহূর্তে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে, সেই মুহূর্তে মানুষ উপলব্ধি করবে যে নারী

[৩] মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃষ্ঠা: ২৫।

সম্পূর্ণ অর্থেমানবতার অংশ, সেই সময়কাল অথবা ঘটনাগুলো সাধারণভাবে গৃহীত সময়কাল অথবা ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এবং ভিন্ন অর্থের ধারক ও বাহক ছিল।[৪]

এ সম্পর্কে Ruth Kelso বলেন,

" ...on a footing of perfect equality with men." For a period that rejected the hierarchy of social class and the hierarchy of religious values in its restoration of a classical, secular culture, there was also, they claim, no question of woman's rights or female emancipation, simply because the thing itself was a matter of course."[5]

এ সম্পর্কে Joan Kelly বলেন,

'...কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়কালের বিরাজমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ- সুবিধা থেকে নারী বঞ্চিত থাকার কারণে একই ঐতিহাসিক ঘটনা নারীর উপর ভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে। যা কিনা পুরুষের অগ্রগতি সাধন করেছে ঠিকই। তাই, আমাদের এই লিঙ্গ ভিন্নতার কারণ খুঁজে বের করতে হবে।'[৬]

Joan Kelly-রতত্ত্ব এই দিকনির্দেশ করছে যে, নারী সাধারণভাবে সামাজিকীকরণের ফলে নিজ শ্রেণীর পুরুষের আগ্রহ ও মতাদর্শকে লালন করে, অনুসরণ করে, তা সত্ত্বেও সামাজিক শ্রেণী হিসেবে নারী সেই অবস্থান থেকেও এগিয়ে যায়। তবু এটা ঠিক, নারীর অবস্থান বিচারে নারীকে নারী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। যেকোনো শ্রেণী, বর্ণ, সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর বিপরীত শ্রেণী, বর্ণ বা গোষ্ঠী হিসেবে নারীকে চিহ্নিত করলে চলবে না। বরং নারীকে দেখতে হবে পুরুষের বিপরীত সংখ্যাগুরু সামাজিক মানুষ হিসেবে। প্রাকৃতিক ও শারীরিক বিভাজন নারীর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা ও পুরুষের অধস্তনতা ও অধীনতা তৈরি করে না। সামাজিকভাবে নির্ধারিত ও গঠিত এবং

[৪] Joan Kelly, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২-৪।

[৫] Ruth Kelso, *The Civilization of the Rennaissance in Italy*, Phaidon Press, London, 1950, page: 241.

[৬] Joan Kelly, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫-৬।

সামাজিকভাবে নারীর ভূমিকা আরোপিত হয় আর সেইভাবেই নারী-পুরুষের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্কগুলো স্বীকৃত হয়।[৭]

এক্ষেত্রে, Michel Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere বলেন,

> "It seems to me that we should be interested in the history of both woman and men, that we should not be working only on the subjected sex any more than an historian of class can focus exclusively on peasants. Our goal is to understand the significance of the sexes, of gender groups in the historian past. Our goal is to discover the range in sex roles and in sexual symbolism in different societies and periods, to find out what meaning they had and how they functioned to maintain the social order or to promote its change."[৪]

Joan Kelly'সামাজিক পরিবর্তন' বিষয়ে বলেছেন,

> নারী ও পুরুষের ভূমিকা এবং কাজের ক্ষেত্রে ঘর-গার্হস্থ্য জগৎসহ বাইরের জগতের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেয়।[৯]

এ সম্পর্কে E. Cary বলেন,

> " a woman joined to her husband by a holy marriage, should share in all his possessions and sacred rites… This law obliged both the married women, as having no other refuge, to confirm themselves entirely to the temper of their husbands and the husbands to rule their wives as necessary and inseparable possessions. Accordingly, if a wife was virtuous and in all things obedient to her husband, she was mistress of the house to the same

[৭] Joan Kelly, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৭-৮।

[৮] Michel Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, *Women, Culture and Society*, Stanford University Press, Stanford, Calif. 1974, Page: 17.

[৯] Joan Kelly, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:৯-১১।

> degree as her husband was master of it, and after the death of her husband she was heir to his property in the same manner as a daughter… But if she did any wrong, the injured party was her judge, and determined the degree of her punishment."[10]

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় যাকে পিতৃতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, এর উত্তরণ ঘটাতে হলে সমাজ পরিবর্তনের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। সেই বিষয়টি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির যেমন কর্তব্য, তেমনই ব্যক্তি পুরুষ ও নারীর নিজেদের দায়িত্ব।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে একটি নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট সমাজ, রাজনীতি ও দেশের নারীদের জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, যুগ যুগ ধরে নারীদের জন্য যে সমাজকাঠামো, গেরস্থির ও লিঙ্গান্তর সামাজিকীকরণ গড়ে উঠেছে, তার মধ্যেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম বিকাশ লাভ করেছে। তাই, ১৯৭১-এর নারীকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবা যাবে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সামাজিক যে প্রেক্ষাপট বিংশ শতকের ষাটের দশকে ছিল, তার মধ্যে নারীদের বিকশিত হয়ে ওঠা ও মানুষ হিসেবে ভূমিকা পালনের কথা সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষের একটি ব্যাপক অংশ ভাবতেই পারেনি। কেউ কেউ যদিও তা ভেবেছেন, তবে তাদের সেই ভাবনাতে নারীকে ব্যতিক্রমী পরিচয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই নারীদের অভিহিত করা হয়েছে 'পুরুষের মতো' বা 'পুরুষের মতো বুদ্ধিসম্পন্ন'। ফলশ্রুতিতে, একাত্তরের নারীদের ভূমিকা বিষয়ে ইতিহাস লিখনের বিস্মৃতি ও অদৃশ্যকরণের অবহেলা থেকে উত্তরণের জন্য প্রথম থেকেই একাত্তরের নারীদের ইতিহাস স্বীকৃত হয়েছে ক্ষতিপূরণমূলক ইতিহাস হিসেবে, যা যথার্থ নয়।

এক্ষেত্রে, Joan Kelly অনুসরণে বলা যায়, এই ব্যতিক্রমী নারীদেরকে যথার্থ স্থানে অধিষ্ঠিত করতে হবে।সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক চিন্তার অন্য একটি উপবিভাগ হিসেবেও একে দেখা যাবে না। অর্থাৎ, কূটনৈতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং এ জাতীয় ইতিহাসের তালিকার পাশাপাশি রাখার জন্য 'নারীকেও একটা ইতিহাস' হিসেবে দেখা যাবে না। কেননা, এই ক্ষেত্রসমূহের বিকাশ নারীদের ইতিহাসের ওপর আঘাত এনেছে। তাই

[১০] E. Cary, *The Roman Antiquities*, Harverd University press, Cambridge, Mass. 1: 381-382.

নৃবিজ্ঞানের মতো ইতিহাসের ক্ষেত্রেও 'নারীবাদী জ্ঞানচর্চার' উদ্ভব ঘটেছে, যা কিনা প্রধানত নারীদের মর্যাদার ওপর দৃষ্টি দেবে।[১১]

উপরিউক্ত নারীবাদী ইতিহাস রচনার তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণে বর্তমান গবেষণাকর্ম *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির পরবর্তী অধ্যায়গুলো পরিচালিত হবে।

৩. গবেষণার বিভিন্ন দিক

৩.১ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নারীর একটা অবিচ্ছেদ্য ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার ইতিহাস। এই ইতিহাসটা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবে এর ভিন্ন দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও নারীদের বিপন্নতা বলা চলে একটা অভিন্নতার ইতিহাস। কেননা একাত্তরের বাংলায় যে সব কন্যা-জায়া-জননী প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের বীরত্বের কাহিনী প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অব্যক্ত রয়ে গেছে। পুরুষেরা যুদ্ধকালীন ছোটখাটো যেকোনো কাজের জন্য মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেও অনেক অসাধ্য সাধন করার পরও নারীদের জুটেছে মাত্র সহযোগী হিসেবে স্বীকৃতি। যে গুরুত্বটুকু নারীদের পাওয়া উচিত ছিল, বরাবরই তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

আর এই সত্য উপলব্ধি করেই, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে নারীরা যে সাহসী আর দৃঢ়প্রত্যয়ীভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন সে সম্পর্কে অনুসন্ধানপূর্বক তথ্যভিত্তিক গবেষণা করাই এই অভিসন্দর্ভের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩.২ প্রাসঙ্গিক গবেষণাসমূহের পর্যালোচনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে ইতোমধ্যে কিছু গবেষণা ও লেখালেখি হলেও এগুলোতে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। কোন কোন লেখক সীমিত কয়েকটি পাতায় উচ্ছ্বাসভরা কথা লিখেছেন যার মাধ্যমে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি শেষ হয়ে যায় না। আবার কোন কোন লেখক

[১১] Joan Kelly, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪-১৫।

অকথিত, বিস্মৃত ও বিলীয়মান অধ্যায়ের শুধুমাত্র খণ্ডিত চিত্র আলোচনা করেছেন যেখানে নারীকে দেওয়া হয়েছে সহযোগী ভূমিকার খেতাব। যার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া অসম্ভব।

রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহেদী সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী* গ্রন্থে প্রণোদক, পরামর্শক, নিয়ন্ত্রক ও সংগঠকের ভূমিকায় নারী; চিকিৎসা ও সেবাকার্যে নারী; বস্ত্র, ঔষধ ও তহবিল সংগ্রাহকের ভূমিকায় নারী; খাদ্য ও আশ্রয়দাত্রী হিসেবে নারী; বোমা তৈরি, অস্ত্রসংগ্রহ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বার্তাবাহকের ভূমিকায় নারী প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখক মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধার ভূমিকা আলোচনার বাইরে রেখেছেন। এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধার ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করা হবে।

কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ [বীরপ্রতীক] রচিত *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী* গ্রন্থে শুধুমাত্র লেখকের দেখা ও তাঁর ফ্রন্টের যোদ্ধাদের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। দু'একজন এসেছেন সহকর্মীদের বর্ণনায় এবং কাহিনী চরিত্রের মাধ্যমে যেখানে নারীদের কেবল সহযোগিতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সহযোগী ছাড়াও নারী যে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে সেগুলো আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* গ্রন্থটি ১৯৮২ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে সর্বমোট ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় উপস্থাপন করেছেন যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে জানার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। তবে এই দলিলপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সশস্ত্র সংগ্রামের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। শুধুমাত্র এই দলিলপত্রের ৮ম খণ্ডে বীরঙ্গনা নারীদের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলার নারীদের উপর যে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিক অত্যাচার ও হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছে সেই দিকটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীদের ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

শামীমা নাসরীন রচিত *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ : পাঁচটি কেস- স্ট্যাডি (১৯৫২-১৯৯৪)* শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভে ভাষা আন্দোলনের দুই জন নারী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই জন নারী এবং শহীদ

জননী জাহানারা ইমাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য নারীর অবদান আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে।

মেহেরুন্নেসা মেরি রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী*গ্রন্থে ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লেখক বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্ততার দিকটি তুলে ধরেছেন। তবে, তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন নারীদের সশস্ত্র অবস্থান উপেক্ষা করেছেন।

সুপা সাদিয়া রচিত *৭১ এর একাত্তর নারী* গ্রন্থে নারীদের সাহায্য-সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা এবং সর্বোপরি বীরাঙ্গনাদের জীবন বিপন্নতা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ, লেখক শুধু নারীদের পরোক্ষ ভূমিকা তুলে ধরেছেন যেখানে তিনি নারীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আলোচনার বাইরে রেখেছেন।

শওকত আরা হোসেন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী* গ্রন্থে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে যেখানে লেখক নারীদের মানবাধিকার, সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব, নারী ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, নারী ও পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে, মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকার বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে বিষয়বস্তুর কোন মিল নেই।

ড. এম এ হাসান রচিত *মুক্তিযুদ্ধ এবং নারী*গ্রন্থে ৭২টি নির্যাতিত নারীদের সাক্ষাৎকার উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে লেখক নারীদের দুঃসহ জীবন, বিপর্যয়, বৈধব্য ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে নারীর জীবন সংকটের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদের ব্যর্থতার দিকটি তুলে ধরেছেন যা মুক্তিযুদ্ধে নারীর সামাজিক অবস্থানের ইতিহাস হিসেবে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকার উপস্থাপন প্রয়োজন।

আ.শ.ম বাবর আলী এর *একাত্তরের নারী মুক্তিযোদ্ধা* গ্রন্থের তারামন বিবি, কাঁকন বিবি, আশালতা বৈদ্য ও শিরিন বানু মিতিল সম্পর্কিত আংশিক আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে, বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

এমাজউদ্দীন আহমদ, জসীম উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) *মুক্তিযুদ্ধে নারী* গ্রন্থের সশস্ত্র যুদ্ধে নারী অধ্যায়ে তারামন বিবি, কাঁকন বিবি, এবং চট্টগ্রামের নন্দরখিল গ্রামের নারী সমাজের প্রতিরোধের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া, মালেকা বেগমের *একাত্তরে নারী*, ফোরকান বেগমের *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, তপন কুমার দে -এর *মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজ* এবং সেলিনা হোসেন, অজয় দাশগুপ্ত ও রোকেয়া কবীর (সম্পাদিত) *সংগ্রামী-নারী যুগে যুগে* গ্রন্থে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা বিষয়ক আংশিক আলোচনা রয়েছে। কিন্তু, এ সকল আলোচনার কোনটিই কেবল মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধা ভিত্তিক নয়। সামগ্রিকভাবে সশস্ত্র নারীযোদ্ধার উপর গুরুত্ব দিয়ে রচিত গবেষণাকর্মের তাই রয়েছে একান্ত অভাব।

কাজেই বর্তমান গবেষণাটিতে মৌলিক উৎসসমূহের সাথে বিদ্যমান দ্বৈতয়িক উৎসগুলির যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারীযোদ্ধার নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

৩.৩ পরিধি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের ভূমিকা দুই ধরনের। যথা-(ক) প্রত্যক্ষ ভূমিকা এবং (খ) পরোক্ষ ভূমিকা। এ গবেষণার পরিধি সাধারণভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধে সশস্ত্র নারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা, বিশেষ করে সশস্ত্র নারীযোদ্ধার সকল প্রতিরোধের স্বরূপ প্রধান আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ- স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর পরোক্ষ ভূমিকা আলোচিত হলেও সম্মুখ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ নারীর ভূমিকা প্রধানত উপেক্ষা এবং ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এসব বিবেচনা করে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে নারীরা মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সেই দিকসমূহ তুলে ধরার বিষয়গুলো এ গবেষণার পরিধির আওতাধীন।

৩.৪ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎসসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সমসাময়িক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা, এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সাময়িকী পত্রসমূহ, অডিও রেকর্ড, ভিডিও রেকর্ড এবং সশস্ত্র নারীযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার। এই সকল প্রাথমিক উৎসসমূহের পাশাপাশি দ্বৈতয়িক উৎসসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং প্রবন্ধমালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণাত্বক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সশস্ত্র অবস্থানের বিষয়টি এই অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. অধ্যায় বিভাজন

এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে যৌক্তিক শৃঙ্খলার মধ্যে রূপ দেওয়ার জন্য উপক্রমণিকা এবং উপসংহারসহ সর্বমোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের উপক্রমণিকা পর্বে প্রাককথন; বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা: তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধান; গবেষণার বিভিন্ন দিক; গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; প্রাসঙ্গিক গবেষণাসমূহের পর্যালোচনা; গবেষণার পরিধি; গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত সশস্ত্র নারীযোদ্ধা তারামন বিবি (বীরপ্রতীক) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত, তারামন বিবিরজন্ম ও বেড়ে ওঠা; কীভাবে তিনি একাত্তরের রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করলেন? সেসব বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে,তারামন বিবির রাঁধুনি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান; অস্ত্র প্রশিক্ষণ; গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ ও মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, তারামন বিবির একাত্তর পরবর্তী জীবন; আত্মোপলব্ধি; শেষজীবন এবং পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধে তারামন বিবির অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবিসম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে, কাঁকন বিবির জন্ম ও বেড়ে ওঠা; একাত্তরের রণাঙ্গনে কাঁকন বিবির তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে যোগদান, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে তাঁর গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ, অস্ত্র প্রশিক্ষণ, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, কাঁকন বিবির একাত্তর পরবর্তী জীবন; আত্মোপলব্ধি, শেষজীবন এবং পরিশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে কাঁকন বিবির ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে,আশালতা বৈদ্যের জন্ম ও বেড়ে ওঠা; একাত্তরের রণাঙ্গনে মহিলা গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে তাঁর যোগদান; অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং হেমায়েত বাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, আশালতা বৈদ্যের একাত্তর পরবর্তী জীবন; আত্মোপলব্ধি এবং পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের দুই জন পুরুষবেশী নারী মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল এবং করুনা বেগম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত, শিরিন বানু মিতিল এবং করুনা বেগমের একাত্তরের রণাঙ্গনের জীবন হিসেবে পুরুষ ছদ্মবেশে যোগদানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে, শিরিন বানু মিতিলের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি; অস্ত্র প্রশিক্ষণ; টেলিফোন ভবন ও কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব; কলকাতার গোবরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ ও কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, একাত্তরের রণাঙ্গনে করুনা বেগমের পুরুষ ছদ্মবেশে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান; অস্ত্র প্রশিক্ষণ; গ্রেনেড দক্ষতা; মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন এবং মুক্তিবাহিনীর অপারেশনের পূর্বে পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানের উপর রেকি বিষয়ে করুনা বেগমের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।এছাড়া, শিরিন বানু মিতিল এবং করুনা বেগমের জন্ম ও বেড়ে ওঠা; একাত্তর পরবর্তী জীবন; আত্মোপলব্ধি, শেষজীবন এবং পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের দুইবোন: মুক্তিযোদ্ধা এস এম মনোয়ারা বেগম এবং মুক্তিযোদ্ধা এস এম আনোয়ারা বেগম সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে, তাঁদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, একাত্তরের রণাঙ্গনে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম নারীদ্বয়ের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি; অস্ত্র প্রশিক্ষণ; মুক্তিযুদ্ধের অভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবে জীবন; গেরিলা প্রশিক্ষণ; মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন; একাত্তর পরবর্তী জীবনযাপন; আত্মোপলব্ধি এবং পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র নারীসমাজ কেন্দ্রিক কয়েকটি কেস-স্ট্যাডি পর্বে একাত্তরের রণাঙ্গনে বরিশালের পেয়ারা বাগান: সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা ওশাহানা পারভীন শোভা; একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্ব প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম ও ফোরকান বেগম; মুক্তিযোদ্ধা স্বর্ণলতা ফলিয়া এবং আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে উপসংহার হিসেবে সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটির মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রথমত, গবেষণাকর্মটি মৌখিক ইতিহাস, স্মৃতিচারণের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। স্মৃতি নির্ভর ইতিহাস পুনর্গঠন বেশ দুরুহ কাজ। তথ্যাবলী যাঁচায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত অনেক সময়ই পাওয়া যায় না, যদিও এ ব্যাপারে সব রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সীমিত সংখ্যক কেস-স্ট্যাডির সহায়তায় গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। আরো বেশি সংখ্যক উপাত্তের সমাহার এই গবেষণার পরিধিকে আরো অর্থবহ করে তুলতে পারত।

তৃতীয়ত, করোনাকালীন সময়ে গবেষণার স্থান বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় সকল স্থানে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার উপর সংগৃহিত সাক্ষাৎকার, অডিও এবং ভিডিও রেকর্ড অনুসরণ করা হয়েছে।

৬.পরিশেষ

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারীসমাজ পিছিয়ে ছিল না। নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সাহসী ও তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত, একাত্তরের রণাঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট ছিল বহুমাত্রিক। মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন কাজের সাথে নারীসমাজ জড়িত ছিল। উল্লেখ্য, রাঁধুনি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন তারামন বিবি। তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন কাঁকন বিবি। মহিলা গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন আশালতা বৈদ্য। পুরুষবেশী নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন শিরিন বানু মিতিল এবং করুনা বেগম।পরবর্তীতে, তাঁরা অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে, রণাঙ্গনে নারীরা প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্রহাতে পুরুষের সাথে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন আবার গোয়েন্দাবৃত্তির মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর জন্য পাকিস্তান ক্যাম্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। কখনো আবার মুক্তিবাহিনীর পক্ষে রেকির কাজ করেছেন। এক্ষেত্রে, তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন-এর পূর্বে পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানের উপর তদারকি করতে এগিয়ে গেছেন পাকিস্তানি ক্যাম্পের সন্নিকটে।পাশাপাশি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠক হিসেবে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম, ফোরকান বেগম এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এস এম মনোয়ারা বেগম, এস এম আনোয়ারা বেগম, বীথিকা

বিশ্বাস, শিশির কণা, শাহানা পারভীন শোভা, স্বর্ণলতা ফলিয়া এবং আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ অসম সাহসীকতার সাথে বীরদর্পে যুদ্ধ করেছেন।

অবশেষে বলা যায়, একাত্তরের রণাঙ্গণে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক খেতাব দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন বীরপ্রতীক তারামন বিবি যার কথা এই অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধের খেতাবপ্রাপ্ত সশস্ত্র নারীযোদ্ধা

তারামন বিবি (বীরপ্রতীক)

অধ্যায়-২
স্বাধীনতা যুদ্ধের খেতাবপ্রাপ্ত সশস্ত্র নারীযোদ্ধা
তারামন বিবি (বীরপ্রতীক)

২.১ তারামন বিবি (১৯৫৭ থেকে ১ ডিসেম্বর ২০১৮)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তারামন বিবি। তিনি একদিকে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে গুপ্তচর হয়ে হানাদারদের ক্যাম্পের গোপন খবর পৌঁছে দিয়েছেন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। মুক্তিযুদ্ধে যে দুজন নারী মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে তারামন বিবি একজন।[১২] তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর হয়ে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন। মূলত, তারামন বিবি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন মুহিব হাবিলদার নামে এক মুক্তিযোদ্ধার উৎসাহে। তিনি তারামন বিবির গ্রামের পাশের একটি ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। তারামন বিবির বয়স যখন মাত্র ১৩ কিংবা ১৪ তখন ঐ মুহিব হাবিলদার তারামন বিবিকে ক্যাম্পে রান্না-বান্নার জন্য নিয়ে আসেন।

পরবর্তীকালে, তারামন বিবির সাহস ও শক্তির পরিচয় পেয়ে মুহিব হাবিলদার তাঁকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেন। তিনি রাইফেল ও স্টেনগান প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর, তিনি রাইফেল ও স্টেনগান প্রশিক্ষণ শেষে কুড়িগ্রাম জেলার শঙ্কর মাধবপুর স্বীয়গ্রামের ১১ নং সেক্টরের অধীনে সেক্টর কমান্ডার আবু তাহেরের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১৩]১৯৭৩ সালের সরকারি গেজেট অনুযায়ী তাঁর বীরত্ব ভূষণ নম্বর ৩৯৪ এবং সরকারি গেজেট অনুযায়ী তাঁর নাম মোছাম্মৎ তারামন বেগম।[১৪]

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমানের সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বীরপ্রতীক উপাধি ঘোষণা করলেও ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। তিনি নিজেও জানতেন না যে, তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

---

[১২] *প্রথম আলো*, ০৫ জুলাই ২০২১।

[১৩] সেলিনা হোসেন, অজয় দাশগুপ্ত ও রোকেয়া কবীর (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে* (প্রথম খন্ড), বাংলার নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৮।

[১৪] *প্রথম আলো*, ০৮ মার্চ, ২০১২।

এরপর, ১৯৯৫ সালে ময়মনসিংহের একজন গবেষক প্রথম তাঁকে খুঁজে বের করেন এবং নারী সংগঠনগুলো তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। সেই সময় তাঁকে নিয়ে পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়। অবশেষে ১৯৯৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর এক অনাড়ম্বর পরিবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারামন বিবিকে বীরত্বের পুরস্কার 'বীরপ্রতীক' পদক তাঁর হাতে তুলেদেন।[১৫]

মূলত, ১৯৯৫ সালের পর থেকে তাঁর ইতিহাস সর্বজনবিদিত। কিন্তু, এর আগের ইতিহাস? তাঁর যাপিত জীবনের চার দশক সময় কেটেছে সে সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা ছিল না সর্বসাধারণের।

অথচ, একজন বীরমুক্তিযোদ্ধার জীবন সম্পর্কে সবাই পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে চায়।
তিনি কোন স্তর থেকে এসেছেন?
তাঁর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?
আর এই বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে এই অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.২ জন্ম ও বেড়ে ওঠা

তারামন বিবির আসল নাম ছিল তারাবানু। তিনি ১৯৫৭ সালের কোনো এক দিন কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজিবপুর উপজেলার শংকর মাধবপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবদুস সোহবান এবং মায়ের নাম কুলসুম বিবি। পিতা আবদুস সোহবান ছিলেন একজন ভূমিহীন কৃষক। জমি-জমা সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না তারাবানুর বাবার, শুধু ছিল দুটি হাত, সেটাই ছিল একমাত্র সম্বল। আবদুস সোহবান এবং কুলসুম বিবি দম্পতির ছিল সাত সন্তান। সাত সন্তানের মধ্যে তারামন বিবি ছিলেন তৃতীয়।[১৬] উল্লেখ্য, দিন এনে দিন খাওয়া সাত ভাই-বোনের দরিদ্র কবলিত এক দুঃস্থ পরিবারে তারামন বিবির বেড়ে ওঠা অন্যের গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করে।[১৭]

[১৫] *The Daily Star*, 01 December, 2021.

[১৬] *সাক্ষাৎকার*: মো. আব্দুস সাত্তার (সহযোদ্ধা, তারামন বিবি), স্থান: কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম, তারিখ: ১৭ মার্চ, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী, মো. রকিবুল হাসান এবং মামুন-অর-রশিদ।

[১৭] *The Daily Star*, 02 December, 2018.

ফলশ্রুতিতে, লেখাপড়া করার কোন সুযোগ ছিল না তাদের। এটি যেন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। জন্ম থেকেই দেখেছেন ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের কষাঘাত। সখ্য গড়ে উঠেছে অভাবের সঙ্গে। অর্থাৎ, তারামন বিবি অর্থনৈতিক অবস্থার কারণেই সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়েছিলেন।[১৮]

মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩/১৪ বছর। একদিন তারাবানু হঠাৎ গ্রামে দেখলেন দলে দলে ট্রাকে ট্রাকে সৈন্য নামছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে দেশে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের গ্রামটি পড়েছিল ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে। তখন ১১ নং সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন সেক্টর কমান্ডার আবু তাহের।[১৯]

পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা ও নৃশংসতা তারামন বিবির মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি করে। তবে অশিক্ষিত, রাজনীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তারামন বিবি নারী হিসেবে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করলেও ধর্মপিতা মুহিব হাবিলদারের উৎসাহে সেই দ্বিধাবোধ কাটিয়ে কুড়িগ্রামের শঙ্কর মাধবপুরের যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। উল্লেখ্য, মুহিব হাবিলদার ছিলেন একজন নির্ভীক সাহসী ও দৃঢ়চেতা মানুষ। তিনি কিশোরী এই মেয়েটির মধ্যে অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাইতো তারামন বিবিকে তিনি বলেন যে,দেশের এই সংকটকালীন সময়ে নারী-পুরুষ কারোরই হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়।[২০]

২.৩ একাত্তরের রণাঙ্গনে তারামন বিবির জীবন

২.৩.১ রাঁধুনি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তারামন বিবির মা পরিবার নিয়ে জনৈক মুক্তিযোদ্ধা আজিজ মাস্টারের বাড়িতে আশ্রয় নেন, যার পাশেই ছিল একটি মুক্তিযোদ্ধা শিবির। এই শিবিরের কমান্ডার ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুহিব হাবিলদার। এই মুক্তিযোদ্ধার উৎসাহে তারামন বিবি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।[২১] উল্লেখ্য, একদিন মুহিব হাবিলদার নামে স্থানীয় ঐ মুক্তিযোদ্ধা তারাবানুদের বাড়িতে এসে বললেন তাদের কাজের বেশ ঝামেলা, সব পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা। তারাবানু যদি ক্যাম্পে রান্নাবান্না ধোয়া মোছা করে দেয় তবে বিনিময়ে তাকে কিছু টাকা দেবে

[১৮] তাজুল মোহাম্মদ, *নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি (বীরপ্রতীক)*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা: ১৩৬।

[১৯] *প্রথম আলো*, ০৫ জুলাই, ২০২১।

[২০] মেহেরুন্নেসা মেরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৪।

[২১] *প্রথম আলো*, প্রাগুক্ত।

ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা। শুনে রাজি হলেন না তারাবানুর মা। মুহিব হাবিলদার দেখলেন বহু বোঝানোর পরেও কিছুতেই টলছেন না তারাবানুর মা।

সেক্ষেত্রে, মুহিব হাবিলদার তারাবানুর মাকে বললেন যে[২২],

'ও আমার ধর্ম মেয়ে, আমি তো ওর বাবার মতোই।
সব দায়িত্ব আমার। আপনার মেয়ে ভালো থাকবে।'

অবশেষে, গ্রামের পাশে দশঘরিয়ায় মুক্তিবাহিনীর সেই ক্যাম্পে রান্নার দায়িত্ব নিতে মেয়েকে ছাড়তে রাজি হলেন তারাবানুর মা। মুহিব হাবিলদারই তাঁর নামের শেষে যুক্ত করেন তারামন।[২৩]পরবর্তীতে, এই মুহিব হাবিলদারকে তারামন বিবি ধর্মপিতা মানেন এবং মুহিব হাবিলদারের কথামতো তারামন বিবি দশগরিয়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে রাঁধুনি হিসেবে যোগদান করেন।

মূলত, তারামনের বয়স যখন মাত্র ১৩ কিংবা ১৪ তখন তিনিই তারামন বিবিকে ক্যাম্পে রান্নাবান্নার জন্য নিয়ে আসেন।প্রথমে তারামন বিবি মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে রান্নার পাশাপাশি, ধোয়ামোছা ও মাঝেমাঝে অস্ত্র সাফ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারামন বিবির সাহস ও শক্তির পরিচয় পেয়ে মুহিব হাবিলদার তাঁকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করান।[২৪]

২.৩.২ অস্ত্র প্রশিক্ষণ

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। একবার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে তাকে অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে, মুহিব হাবিলদার খানিকটা অবাক হলেন। তদুপরি, মুহিব হাবিলদার তারামন বিবির যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ দেখে তাকে রাইফেল চালানো শেখান। উল্লেখ্য, বয়সে ছোট হওয়ায় প্রাথমিক অবস্থায় তারামন বিবিকে মুহিব হাবিলদার স্টেনগান চালানোর প্রশিক্ষণ দেন।পরবর্তীকালে, তিনি সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল প্রশিক্ষণ নেন।

[২২] *সাক্ষাৎকার*: মো. আব্দুস সাত্তার (সহযোদ্ধা, তারামন বিবি), প্রাগুক্ত।
[২৩] *প্রথম আলো*, প্রাগুক্ত।
[২৪] *The Daily Star*, প্রাগুক্ত।.

২.৩.৩ গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ

অস্ত্র প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ধর্মপিতা মুহিব হাবিলদার তারামন বিবিকে গোপন দূতের কাজ করার কৌশল শেখান।[২৫] মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রাঁধুনি থেকে হয়ে ওঠা নির্ভীক তারামন বিবি পাগলীর বেশে ছেঁড়া বেশভূষা নিয়ে চলে যেতেন পাকিস্তানি ক্যাম্পে খবর আনতে। কখনো সারা শরীরে কাদামাটি, চক, কালি, মানুষের বিষ্ঠা লাগিয়ে চুল এলোমেলো করে পাগল সেজে অথবা বোবা সেজে দীর্ঘক্ষণ হাসি আর কান্নার অভিনয় করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এভাবে নানান বেশে জান-মানের ভয় না করে, কেবল দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তিনি ছদ্মবেশে পাকিস্তানি বাহিনীর খবর নিয়ে আসতেন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে।[২৬]

উল্লেখ্য, তিনি দারুণ অভিনয় করতে পারতেন চোখের পলকেই। কখনো এমন হয়েছে পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে ঢুকেছেন মাথায় চুলে জট লাগানো পাগলের বেশে, কখনো সারা শরীরে কাদা লাগিয়ে, কখনো পঙ্গুর অভিনয় করে। পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে ঢুকে শুনতেন নানান গোপন তথ্য। ক্যাম্পের সবাই তাঁকে মনে করতো পাগল নয়তো মাথায় ছিটগ্রস্ত। পাশাপাশি, বিভিন্ন অপারেশনের আগে কলার ভেলায় করে তারামন বিবি মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের রসদ, অস্ত্র গোলাবারুদ পৌঁছে দিয়েছেন জায়গা মতো।[২৭]

তেমনই এক ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের অক্টোবর মাসের। একপাশে খাড়িয়াভাঙ্গা অন্যপাশে ভেলামারি খাল। এক গ্রামে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প, অন্য গ্রামে পাকিস্তানিদের। মধ্যে একটা খাল পড়েছে। সারা শরীরে কাদা আর পাগলের বেশ ধরে সেবার পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে গিয়েছিলেন তারামন বিবি। সামনে তখন হানাদার বাহিনীর সদস্যরা। তাঁর সারা গায়ে কাদা, মাথায় চুলের জট, কাপড় ছেঁড়া, হাত পা যেন অনেকখানি বিকলাঙ্গ। তারামন বিবিকে দেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা অশ্লীলভাবে গালি দিচ্ছিলো, জবাবে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছিলেন তারামন বিবি। এদিকে আর্মির সদস্যরা ভাবলো পাগলের কতো রকমফের। নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টায় লিপ্ত হলো তারা। ঐ ফাঁকে তারামন বিবি পাগলের বেশে মোটামুটি অনুমান করে নিলো ক্যাম্পের সমস্ত জায়গার। কোন পাশে হামলা করলে সবচেয়ে ভয়ংকর হবে পাকিস্তানিদের জন্য, কোন পয়েন্ট দিয়ে পাকিস্তানিদের উপর হামলা করতে হবে। এই সকল রেকির কাজ কৌশলে বিনা বাধায়সম্পন্ন করেন তারামন বিবি। এরপর, পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সাঁতরে খাল পেরিয়ে অপর পাড়ে উঠে তারামন বিবি মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে

---

[২৫] মেহেরুন্নেসা মেরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৩।

[২৬] মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ৪৭।

[২৭] *সাক্ষাৎকার:* মো. আব্দুস সাত্তার (সহযোদ্ধা, তারামন বিবি), প্রাগুক্ত।

সকল তথ্য পোঁছে দেন। তাঁর নির্ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে নদীর অপর পাড়ে পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে আক্রমণ হলো পরদিনই।[২৮]

মূলত, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি কুড়িগ্রামের রৌমারি পুলিশ স্টেশন এলাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অবস্থানের উপর তথ্য সংগ্রহ করতেন। সেই সময় তিনি ক্যাম্পে রান্নার কাজের পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করতেন।[২৯]

এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, জার্মান তরঙ্গ, ডয়চে ভেলে (Deutche Welle), তারামন বিবি স্বীকারোক্তি দেন যে,[৩০]

> "কোদালকাঠিতেই আমার প্রথম ক্যাম্প জীবন শুরু। রান্না করা, ডেক ধোয়া। অস্ত্র পরিষ্কার করা। একদিন আজিজ মাস্টার বললেন, পাকিস্তানি ক্যাম্পের খবর আনতে হবে। কোনো পুরুষ যেতে পারবে না। যেতে হবে আমাকে। তাও নদী (নদ) পার হয়ে। কথাগুলো শুইননাই কইলজাটা চিনচিন করে উঠল। রাজি হয়ে গেলাম, যা থাকে কপালে! পাগলির বেশে, ছেঁড়া কাপড় পরে গেলাম শত্রু ক্যাম্পে।"

পরবর্তীকালে, সহকর্মীদের কাছ থেকে তিনি অস্ত্র চালনাসহ স্টেনগান হাতে নিয়ে আলফা প্রশিক্ষণ নেন, যা একধরনের যুদ্ধকৌশল। তিনি তৎকালীন রৌমারী থানা এলাকায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে অংশ নেন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২.৩.৪ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন

তারামন বিবির প্রথম যুদ্ধ ছিল মুক্তিবাহিনীর দশগরিয়া ক্যাম্পের প্রতিরোধ। এটি ছিল সম্মুখ যুদ্ধের ঘটনা। মধ্যদুপুরে সবাই খেতে বসেছে তখন, কেবল তারামন বিবি খেয়ে দেয়ে চারপাশে নজর রাখছেন। কমান্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী তারামন বিবি সুপারি গাছের উপরে উঠে দৃষ্টি রাখছেন। হঠাৎ দেখলেন পাকিস্তানিসেনাবাহিনীর একটি গানবোট দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানালেন

---

[২৮] *প্রথম আলো*, প্রাগুক্ত।

[২৯] *The Daily Star*, প্রাগুক্ত।

[৩০] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: বেগম তারামন বিবি (বীরপ্রতীক), জার্মান রেডিও, ডয়চে ভেলের কাছে প্রদেয়, সম্পাদক: সঞ্জীব বর্মন, প্রতিবেদক: হোসেইন আব্দুল হাই, তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

কমান্ডারকে। সবার খাওয়া চলছে তখন। খাওয়া ছেড়ে সবাই নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে নিলেন মুহূর্তের মধ্যেই। সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধ চলেছিল সেদিন। তারামন বিবি না দেখলে ক্যাম্পের সকল মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন শহীদ হয়ে যেতেন।[৩১]

এক্ষেত্রে, তারামন বিবি জানান যে[৩২],

> 'শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে অস্ত্র চালানো শিখলাম। একদিন দুপুরবেলা, ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। ক্যাম্পের আমরা সবাই ভাত খাচ্ছিলাম। এ সময় আজিজ মাস্টার আমাকে পিছলা গাছে উঠতে বললেন। গাছে উঠে দূরবীন দিয়ে নদীর দিকে দেখতেই চোখ বড় হয়ে গেল। নদীতে গানবোট। কিসের আর ভাত খাওয়া। সেদিন বৃষ্টির মতো গুলি চললো সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমি কখন যে স্টেনগান নিয়ে গুলি করতে শুরু করেছি খেয়াল করিনি। কনুই আর পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়া কত জায়গা যে পার হয়ে গেছি। রক্ত বের হয়ে গেছিল।'

এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, জার্মান তরঙ্গ, ডয়চে ভেলে (Deutche Welle), তারামন বিবি (বীরপ্রতীক) স্বীকারোক্তি দেন যে[৩৩],

> "ঘটনা ছিল ঠিক মধ্য দুপুরের। সবাই খেতে বসেছে। আমাকে পাকিস্তানি সেনাদের কেউ আসছে কি না তা দেখার জন্য বলা হলো। আমি সুপারি গাছে উঠে দূরবীন দিয়ে চারিদিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, পাক বাহিনীর একটি গানবোট আমাদের দিকে আসছে। সবায় খাওয়া বন্ধ করল। দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে অ্যাকশনের অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। আমি সবার সাথে যুদ্ধে অংশ নেই। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। সেদিন আমরা শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হই। এরপর, অনেক যুদ্ধে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অংশ নেয়। অনেকবার আমাদের ক্যাম্প পাকবাহিনী আক্রমণ করেছে,তবে ভাগ্যের জোরে প্রতিবার বেঁচে যাই।"

[৩১] *প্রথম আলো*, ০৫ জুলাই ২০২১।
[৩২] মতিউর রহমান, *একাত্তরের বীরযোদ্ধা: খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃষ্ঠা: ২১৭।
[৩৩] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: বেগম তারামন বিবি (বীরপ্রতীক), প্রাগুক্ত।

তিনি আর ও জানান যে[৩৪],

> 'শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয় নানা কৌশলে শত্রু পক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গেছি পাক বাহিনীর শিবিরে। কখনও সারা শরীরে কাদা মাটি, চক, কালি এমনকি মানুষের বিষ্ঠা পর্যন্ত লাগিয়ে পাগল সেজেছি। চুল এলোমেলো করে, বোবা সেজে পাকিস্তান সেনাদের সামনে দীর্ঘ হাসি কিংবা কান্নার অভিনয় করেছি। কখনও প্রতিবন্ধী কিংবা পঙ্গুর মতো করে চলা ফেরা করে শত্রু সেনাদের খোঁজ নিয়ে এসেছি নদী সাঁতরে গিয়ে। আবার কলা গাছের ভেলা নিয়ে কখনও পাড়ি দিয়েছি ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী। আর জান-মানের কথা না ভেবেই এসব দুঃসাহসী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি মুক্তির জন্য।'

এরপর, ১৯৭১ সালের ১৩ই আগস্ট চরনেওয়াজী স্কুলের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর এক প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। বিকাল ৩ টা থেকে রাত ৪ টা পর্যন্ত চলা এই যুদ্ধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষের অবিরাম গোলাবর্ষণ হয়। এই যুদ্ধে তারামন বিবি নিজে অস্ত্রচালনার মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপক্ষে মুক্তিবাহিনীর হয়ে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, তিনি কোদালকাটি, রাজীবপুর, তারাবর সাজাই ও গাইবান্ধার ফুলছড়ি অঞ্চলে কয়েকটি সশস্ত্র যুদ্ধে পুরুষ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধেঅংশ নেন।[৩৫]

২.৪ একাত্তর পরবর্তী জীবন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৩ সালে তৎকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তারামন বিবিকে তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন।[৩৬] কন্তু এ খবরও জানতে পারেননি তারামন বিবি। একসময় পুরোপুরি লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন তারামন বিবি। পরবর্তীতে, আব্দুল মজিদ নামের একজন দিন মজুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই দম্পতির রয়েছে এক ছেলে

[৩৪] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: বেগম তারামন বিবি (বীরপ্রতীক), প্রাগুক্ত।
[৩৫] রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১০২।
[৩৬] *ভোরের কাগজ*, প্রাগুক্ত।

এক মেয়ে।[৩৭] বিয়ের পর দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তারামন বিবির স্বামী আব্দুল মজিদও জানতেন না, তাঁর স্ত্রী একজন মুক্তিযোদ্ধা।

এক সাক্ষাৎকারে স্বামী আব্দুল মজিদ বলেন,

> 'হ্যায় যে মুক্তিযোদ্ধা, হেইডা বিয়ের পরও বুঝি নাই। লেহা পড়া নাই, চরের মধ্যে বাড়ি। পেটের ভাত জোগাড় করতেই দিন চইলা যাইত, হ্যাই খবর কেমনে নিমু?'

তাঁরা তাকে জানতেন তারাবানু নামে। উল্লেখ্য, তাদের বাড়িতে তারামন বিবির খোঁজে গিয়ে খোঁজ নেয়া অধ্যাপকেরাই কাগজপত্র দেখিয়ে বললেন এই তারাবানুই হচ্ছে তারামন।

অর্থাৎ, ১৯৯৫ সালে তাঁর খোঁজ মিলে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক বিমল কান্তির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে, বিমল কান্তিকে সহায়তা করেন কুড়িগ্রামের রাজীবপুর কলেজের অধ্যাপক আবদুস সবুর ফারুকী। মূলত, মুক্তিযুদ্ধের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের উপর কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন তারামন বিবিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরবর্তীতে, অধ্যাপক বিমল কান্তি, অধ্যাপক আবদুর সবুর ফারুকী ও সোলায়মান আলীর মাধ্যমে খোঁজ পাওয়া যায় তারামন বিবির।[৩৮]

এরপর, নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা কয়েকটি সংগঠন তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন।[৩৯] সেই সময় তাঁকে নিয়ে পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়। সর্বোপরি, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এক অনাড়ম্বর পরিবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে বীরপ্রতীক পদক তুলে দেন।[৪০]

এক্ষেত্রে, তারামন বিবি স্বীকারোক্তি দেন যে,[৪১]

> 'স্বাধীনতার পর শুরু হলো আরেক জীবন। আম্মা-ভাইবোনদের খুঁজে পেলাম। থাকার জায়গা নাই, খাবার নাই, চরে আমরা ঘর বাঁধলাম। কাজ নিলাম মানুষের বাড়িতে। চরেই শুরু হলো

[৩৭] *সাক্ষাৎকার:* মো. আব্দুস সাত্তার (সহযোদ্ধা, তারামন বিবি), প্রাগুক্ত।
[৩৮] প্রথম আলো, ০৫ জুলাই, ২০২১।
[৩৯] *প্রথম আলো*, প্রাগুক্ত।
[৪০] *Bangladesh Observer,* প্রাগুক্ত।
[৪১] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* বেগম তারামন বিবি (বীরপ্রতীক), প্রাগুক্ত।

আমাদের জীবন। চর ভাঙে, আমাদের ঘর ভাঙে। আবার ঘর বানাই। এভাবেই চলে যায় চব্বিশটা বছর।'

তারামন বিবিকে নিয়ে আনিসুল হকের লেখা *বীর প্রতীকের খোঁজে* নামক একটি বই রয়েছে। পাশাপাশি, আনিসুল হক রচিত 'করিমন বেওয়া' নামক একটি বাংলা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন তারামন বিবি।[৪২]

২.৫ আত্মোপলব্ধি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন নারী মুক্তিযোদ্ধারা। একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার সংগ্রহ, তথ্য সংগ্রহ অন্যদিকে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ। মূলত, ১৯৭১সালের চৈত্র মাসে জনৈক আজিজ মাস্টার নামের একজন ব্যক্তি মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার মুহিবের সঙ্গে তারামন বিবির পরিচয় করিয়ে দেন। পরবর্তীতে, মুক্তিযোদ্ধা মুহিব হাবিলদারের সহায়তায় তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

এই প্রশ্নের প্রত্যুৎত্তরে তারামন বিবি স্বীকারোক্তি দেন যে,[৪৩]

> "আমাদের বাড়ি ছিল রাজীবপুরের আলেকচর শংকর-মাধবপুর ইউনিয়নে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ১৪। সে সময় দেশে শুরু হলো তোলপাড়। শয়ে শয়ে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে। কে কোথায় যাচ্ছে জানি না। আমরাও পালিয়ে যাই কোদালকাঠিতে। একদিন, দিন-তারিখ মনে নাই, জঙ্গলে কচুর মুখি তুলছিলাম। একজন বয়স্ক মানুষ (মুহিব হাবিলদার), আমাকে বললেন, "তুমি আমাদের ক্যাম্পে কাজ করবা?ভাত রাইন্ধা দিবা। কী, পারবা না মা?" সেদিন কোথা থেকে যেন একটা শক্তি পেলাম। মনে হলো, এই তো সুযোগ। মাথার ওপর রক্ষা করার মতো কেউ নাই, যার ভরসায় বেঁচে থাকব। মরতে তো হবেই। যুদ্ধ করে বাঁচার চেষ্টা করলে দোষের কী?তাঁকে বললাম, আফনে আমার মায়ের লগে কথা কন। উনি যাইবার দিলে যাইমু। সেই সন্ধ্যায় তিনি আমার মার কাছে যান। শুধু বিশ্বাসের ওপর আমার মা আমাকে তাঁর সাথে যেতে দেন।"

[৪২] *প্রথম আলো*, প্রাগুক্ত।

[৪৩] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* বেগম তারামন বিবি (বীরপ্রতীক), প্রাগুক্ত।

এ সম্পর্কে তারামন বিবি আরও বলেন,[৪৪]

> "শুরুতে, আমি রান্নার কাজ করতাম। তারপর গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে পাকিস্তানি ক্যাম্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছে দিতাম। এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমি পাগলের ছদ্মবেশ ধারণ করতাম। আমার তথ্যের উপর ভিত্তি করে মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করত।"
>
> " Initially, in between my cooking chores, I would be sent to observe the positioning of the enemy. I would pretend to be a mad woman and collect information…The freedom fighters would execute their operations based on the informations," Taramon said.[45]

পরবর্তীতে, মুহিব হাবিলদার তাঁকে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নিতে যুদ্ধকৌশল, অস্ত্র পরিচালনার শিক্ষা দেন।

এ সম্পর্কে তিনি জানান যে,

> "আমি নিজেও কখনো ভাবতে পারিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে আমি একজন পূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সৈনিকরূপে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অংশ হব।"
>
> "I didn't even realize when the 14 years old teenager Taramon became a soldier while working with the soldier of the east Bengal Regiment…" she said.

[৪৪] *The Daily Star*, 02 December, 2018.
[৪৫] *The Daily Star*, প্রাগুক্ত।

তারপর, ১৯৭১ সালের শ্রাবণ মাসের বিকাল বেলা তিনি প্রথম অস্ত্রসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এক্ষেত্রে তিনি বলেন,[৪৬]

> "A bullet fired by me hit a Pakistani soldier. I then loaded the magazine even more enthusiastically and fired at them continuously…After fighting like this until dusk, the Pakistani army refracted."

পরবর্তীতে, বীর উত্তম আবু তাহেরের নেতৃত্বে ১১ নং সেক্টরের অধীনে তিনি বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। ১৯৭১ সালের এই সাহসিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭৩ সালে তাঁকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাঁর এই সম্মান পেতে সময় লেগেছে দীর্ঘ ২৪ বছর। যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর বিন্দুমাত্র দাবি পূরণ হয়নি, হয়নি তাঁর বা তাঁদের অবস্থান। কেননা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও সেই একই অবস্থা, সর্বত্র বিরাজমান রয়েছে দারিদ্র্য আর দারিদ্র্যময় জীবন।

এ সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন যে,

I WANTED AN ENEMY- FREE BANGLADESH,
I WANTED A POVERTY-FREE HAPPYBANGLADESH.

> "With many dreams, the country became independent. A different life began. I returned to Rajibpur. I met my mother and siblings. We were once again consumed by poverty. I took up a job in someone's house."

[৪৬] *The Daily Star*, প্রাগুক্ত।

In the final part of her interview, Taramon said,

> "It's true that I am no longer suffering from poverty but I have yet to see the country that I had envisioned…
>
> Even now freedom fighters live in poverty. Many die without receiving any treatment. I didn't want to see such a Bangladesh. I wanted an enemy- free, happy Bangladesh."[47]

২.৬ শেষজীবন

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি (বীরপ্রতীক) ফুসফুস ও শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে কুড়িগ্রামের নিজ বাড়ি থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) -তে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

এর আগে তিনি জানুয়ারি, ২০১৬, রংপুর সি.এম.এইচ.(সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল)-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ রংপুর সিএমএইচ থেকে নিজ বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুরে যান। কিন্তু দু'সপ্তাহ পর তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে ময়মনসিংহে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি তখন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগের ডা. এসকে অপু ও ডা. আশীষ কুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

ঐ সময় ডা. এসকে অপু জানান, "তাঁকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আগের চেয়ে উন্নতির দিকে। তাঁর চিকিৎসার ব্যয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহন করছেন। তিনি ফুসফুসের জটিল রোগে ভুগছেন।"[৪৮]

[৪৭] *The Daily Star*, প্রাগুক্ত।
[৪৮] *জাগো নিউজ ২৪.কম*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

এরপর, নভেম্বরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, তাঁকে ঢাকা সিএমএইচে ভর্তি করা হয়। অবশ্য কদিন পরেই তিনি ফিরে যান নিজ বাড়িতে।

অর্থাৎ, বীরপ্রতীক তারামন বিবি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুস, ডায়াবেটিস আর শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে ভুগছিলেন। বিশেষ করে শীত শুরু হওয়ায় তাঁর ঠাণ্ডা লেগে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেত।

এক্ষেত্রে, আত্মীয় স্বজনরা জানান, "গত কয়েকদিন ধরে তিনি নিজে নিজে হাঁটা চলা ভালোভাবে করতে পারছিলেন না"[৪৯]

অতঃপর, ১ ডিসেম্বর ২০১৮, শুক্রবার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটে এবং রাত ১: ৩০ মিনিটে তিনি পরলোকগমন করেন।'[৫০] মৃত্যুকালে তারামন বিবি (বীরপ্রতীক) -এর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে রাজিবপুর উপজেলার কাচারীপাড়া তালতলা কবরস্থানে দুপুর ২টায় সমাধিস্ত করা হয়।[৫১] গার্ড অফ অর্নারে অংশ নেন কুড়িগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন, পুলিশ সুপার মেহেদুল করিমসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।[৫২]

পরবর্তীতে, তাঁর মৃত্যুদিবস উপলক্ষে গ্রামের বাড়ি রাজিবপুর উপজেলার কাচারীপাড়া গ্রামেপারিবারিকভাবে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

২.৭ পরিশেষ

তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের সঙ্গে কুড়িগ্রাম জেলার নদী-তীরবর্তী অঞ্চল মোহনগঞ্জ, তারাবর, কোদালকাটি ও গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়িতে অগ্রবর্তী দলের হয়ে কয়েকটি সশস্ত্র যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। রাজিবপুর অঞ্চলের রণাঙ্গনে কিশোরী তারামন বিবি নির্ভয়ে ও দক্ষতার সাথে

[৪৯] *যুগান্তর*, ১ ডিসেম্বর, ২০১৮।

[৫০] *The Daily Star*, প্রাগুক্ত।

[৫১] *প্রতিদিনের সংবাদ*, ১০ মার্চ, ২০২১।

[৫২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ডিসেম্বর, ২০১৮।

গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ করেছিলেন। খাড়িয়াভাঙ্গা ও ভেলামারি খাল এলাকায় পাকিস্তান সেনাঘাঁটির অবস্থান সম্পর্কে তাঁর সংগৃহীত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল সফল অভিযান। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অংশ নেন। তারামন বিবি কখনই নিজের জন্য ভাবেননি। অনেক বার তাঁদের ক্যাম্প পাকস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছে, তবে ভাগ্যের জোরে প্রতিবারই তিনি বেঁচে গিয়েছেন।

পরবর্তীকালে, ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তাঁকে "বীরপ্রতীক" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বীরপ্রতীক তারামন বিবির মত অসংখ্য নারী স্বাধীনতাযুদ্ধের অনেক ক্ষেত্রে জীবনবাজি রেখে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন। এমন আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা হলেন কাঁকন বিবি। তাঁর কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধের আদিবাসী নারী কাঁকন বিবি

অধ্যায়-৩
স্বাধীনতা যুদ্ধের আদিবাসী নারী কাঁকন বিবি

৩.১ কাঁকন বিবি

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তারামন বিবি (বীরপ্রতীক) ন্যায় সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণকারী কাঁকাত হেননিঞতা নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কাঁকন বিবি নামে সুপরিচিত[৫৩]। মূলত, জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন একজন গ্রাম্য পাহাড়ি খাসিয়া নারী। মুক্তিযুদ্ধের সুদীর্ঘ ২৫ বছর পরনিভৃত জীবন শেষে, তিনি সকল অন্ধকার অতিক্রম করে জনসম্মুখে আসেন। আদিবাসী গ্রাম্য এই নারী মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীরযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও গুপ্তচর। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী হিসেবে তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি একাধিক যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। উল্লেখ্য, তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে মুক্তিবাহিনীর হয়ে ৫ নং সেক্টরে প্রথমে গুপ্তচর এবং পরবর্তীতে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেন। তাঁর মুক্তিযোদ্ধা সনদ নম্বর ম ১৫৮০৩৩।[৫৪] স্বাধীনতার ২৫ বছর পর, ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করার ঘোষণা দেন। তবে বর্তমান পর্যন্ত এ বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো গেজেট প্রকাশিত হয়নি।

৩.২ জন্ম ও বেড়ে ওঠা

কাঁকন বিবির জীবন ইতিহাস বেশ জটিল। মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়া পরিবারে জন্ম কাঁকন বিবির পারিবারিক নামকাঁকাত হেননিঞতা, ডাক নাম কাঁকেই। তিনি ব্রিটিশ ভারতের মিজোরাম প্রদেশে এক খাসিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য নেই।[৫৫] অনুমান করা হয়, তাঁর জন্ম বিংশ শতাব্দির চল্লিশের দশকে। তাঁর বাবার নাম গিসয় খাসিয়া। তিনি জুমচাষের সঙ্গে আজীবন জড়িত ছিলেন। মায়ের নাম মেলি খাসিয়া। তিনি স্বামীকে জুমচাষে সহযোগিতা করতেন এবং গৃহ সামলাতেন। গিসয়-মেলি দম্পতির ছিল তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় ছেলে উহর, মেজো ছেলে উসাল, ছোট ছেলে উফান। আর বড় মেয়ে কাফল এবং সবার ছোট মেয়ে ছিল কাঁকন বিবি। তাঁদের পরিবারটি ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। কাঁকন বিবির

[৫৩] জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, *বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১, পৃষ্ঠা: ৯২।

[৫৪] *The Daily Star*, ৩০ জুন, ২০০৯।

[৫৫] প্রতিদিনের সংবাদ, ১০ মার্চ, ২০২১।

বয়স যখন ছয় মাস, তখন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর বাবা গিসয় খাসিয়া মৃত্যুবরণ করেন। বাবার মৃত্যুর ছয় মাসের মাথায় চিরবিদায়ে যান মা মেলি খাসিয়া। অভাবের সংসারে পাঁচটি এতিম সন্তান একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে তখন। পিতা-মাতার জমি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ফলে অল্প বয়সি ভাইদের উপার্জনের জন্য কাজে লাগাতে হয়। তাঁদের আর খুব বেশি পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি। তবে খাসিয়ারা যেহেতু একটি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করে, সেহেতু প্রতিবেশীদের কেউ কেউ তখন পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। গিসয় খাসিয়াও মেলি খাসিয়ার অন্য ভাইবোনদের অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল ছিল না যে, তাঁরা এতিম সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেবেন। কাঁকন বিবিদের গ্রাম ছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের খুবই কাছে। গ্রামের নাম নক্রাই। সেটি চেলা বাজার থেকে মাইল ছয়েকের পথ। কাঁকন বিবির ভাইদের পরিবার এখনো সেখানেই থাকে।

কাঁকন বিবির বয়স যখন ৮-৯ মাস, তখনই তাঁর বড় বোন কাফলের বিয়ে হয়ে যায় এক বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে। তাঁর নাম খুশি কমান্ডার। মূলত তিনি ব্রিটিশ আমলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে চাকরি করতেন। এ কারণেই লোকে তাঁকে কমান্ডার বলত। খুশি কমান্ডারের বাড়ি ছিল সিলেট জেলার কাঁঠালবাড়ি গ্রামে। খুশি কমান্ডার কাফলকে বিয়ে করার পর নিজের গ্রামেই ফিরে আসেন। তাঁদের বেশ জমিজমা ছিল। স্থানীয়ভাবে তাঁরা ছিলেন অবস্থা সম্পন্ন। মা মারা যাওয়ার পর দুগ্ধ শিশু কাঁকন বিবিকে দেখাশোনা করতেন তাঁর বড় বোন কাফল। কিন্তু তাঁর বিয়ের পর কাঁকন বিবিকে দেখাশোনা করার আর কেউ রইল না। অবশেষে, কাফলই তাঁর স্বামীর সহযোগিতায় কাঁকন বিবিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে সন্তানের মতো মানুষ করতে থাকেন। খুশি কমান্ডার ছিলেন গোড়ামি মুক্ত একজন উদার প্রকৃতির মানুষ। খুশি কমান্ডারের গৃহস্থ পরিবারেই কাঁকন বিবির বেড়ে ওঠা। মা বলতে তিনি বোঝেন বড় বোন কাফলকে আর বাবা বলতে বোঝেন খুশি কমান্ডারকে। খুশি কমান্ডারের পরিবারের অন্য সদস্যরা এতিম এই শিশুটিকে পরম স্নেহেই বড় করে তোলেন। কাঁকন বিবি তাঁর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর এ দেশকেই নিজের দেশ বলে জেনে এসেছেন।[৫৬]

তারপর, ১৯৬৬ সালে সীমান্তবর্তী এলাকায় কর্মরত পাঞ্জাবি ইপিআর সৈনিক আব্দুল মজিদ খানের সঙ্গে কাঁকন বিবির পরিচয়, তারপর পরিণয় এবং এপ্রিল মাসে তাঁদের বিয়ে হয়। মজিদ খান তখন কর্মসূত্রে সিলেট ইপিআর ক্যাম্পে থাকতেন। তাঁর এই দাম্পত্য জীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্বামী আব্দুল মজিদ খান কাঁকন বিবিকে কিছু

[৫৬] *প্রতিদিনের সংবাদ*, প্রাগুক্ত।

না জানিয়ে হঠাৎ বদলি হয়ে চলে যান। কাঁকন বিবি কয়েকদিন অপেক্ষার পর খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তাঁর স্বামী বদলি হয়ে গেছেন। তিনি দোয়ারাবাজার সীমান্ত এলাকার কোনো এক ক্যাম্পে আছেন। এরপর, তিনি আর কাঁকন বিবির সাথে যোগাযোগ করেননি। এভাবে ৩ বছর কেটে যাই। আব্দুল মজিদ খান আর ফিরে আসেনি। কোন চিঠিপত্রও দেয় নি।

এই প্রেক্ষাপটে, ভগ্নিপতি খুশি কমান্ডার তাঁর বোন কাফলকে বলেন,

> 'কত দিন হয়ে গেল অথচ মজিদ আসলো না, আর কোন চিঠিপত্রও দিল না। এভাবে আর কত দিন। তাহলে কি দোয়ারাবাজারের শাহিদ আলীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিব। শাহিদ আলী বিয়ে করতে চায়।'

অতঃপর, পারিবারিকভাবে শাহিদ আলীর সাথে কাঁকন বিবির দ্বিতীয় বিয়ে হয়।[৫৭]

এক্ষেত্রে, সুনামগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার আবু সুফিয়ান বলেন যে[৫৮],

> "ভারতের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে খাসিয়া সম্প্রদায়ের এক পরিবারে জন্ম কাঁকন বিবির। ১৯৭০ সালে দিরাই উপজেলার শাহীদ আলীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর নাম পরিবর্তিত হয়ে নুরজাহান বেগম করা হয়। তাঁর বর্তমান বসতি ছিল দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের ঝিরাগাঁও গ্রামে।"

মুক্তিযুদ্ধের আগে তাঁর এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা সন্তান জন্মদানের কারণে স্বামী শাহিদ আলীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য দেখা দেয়। একপর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁদের মধ্যে মৌখিক ছাড়াছাড়ি হয়। স্বামী শাহিদ আলী কাঁকন বিবিকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। কাঁকন বিবি তখন কোথায় যাবে। কাঁকন বিবি প্রথম স্বামীকে খুঁজতে বের হন[৫৯]। তখন, ১৯৭১ সালের জুন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ চলে, ঐ এলাকায় চরম নির্মমতা নেমে আসে। আর অপেক্ষা না করে তিনি সীমান্তের কাছে ঝিরাগাঁও গ্রামে কমান্ডার শহীদ মিয়ার কাছে মেয়ে সখিনাকে রেখে দোয়ারাবাজারের টেংরাটিলা ক্যাম্পের দিকে যান। ঐ সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে তিনি ধরা পড়েন। কয়েকদিন অমানুষিক নির্যাতনের পর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

---

[৫৭] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):* **কাঁকন বিবি**, লক্ষীপুর, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ। সংগ্রাহক: 1971 archive.org, 26 January, 2017.

[৫৮] *যুগান্তর*, প্রাগুক্ত।

[৫৯] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র)*: কাঁকন বিবি, প্রাগুক্ত।

ঐ অমানবিক ঘটনার পর কাঁকন বিবি ছিলেন মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত। তাঁর একটি মাত্র কন্যাসন্তান, নাম- সখিনা বেগম। তাকে নিয়ে কোনমতে চলছিল তাঁর সংসার।[৬০]

তিনি কীভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন?

সে সম্পর্কে কাঁকন বিবি স্বীকারোক্তি দেন যে,[৬১]

> "সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার সংলগ্ন খাসিয়ার নথরাই পাহাড়ে আমাদের বাড়ি ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের নথরাই থেকে দোয়ারাবাজারে স্বামীর খোঁজে চলে আসি। কিন্তু তাঁর দেখা মেলেনি। তখন ছিল জুন মাস। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর তখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল। শিশুকন্যা সখিনাকে সীমান্তবর্তী ঝিরাগাঁও গ্রামে কমান্ডার শহীদ মিয়ার আশ্রয়ে রেখে দোয়ারাবাজারের টেংরাটিলা ক্যাম্পে আবার স্বামীর খোঁজে বের হই। দোয়ারাবাজার সীমান্তে এসে দেখি পাকিস্তানি হায়েনারা বাঙালি নারী, শিশু ও পুরুষের ওপর অমানবিক অত্যাচার করছে। তখন আমার মধ্যে পাহাড়ি মেয়ের সৌন্দর্য ছিল। একদিন নরপিশাচ পাকিস্তানি বাহিনী আমাকে আটক করে নিয়ে যায়। বাংকারে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালায়। হানাদার ও স্থানীয় দোসর রাজাকাররা অমানুষিক নির্যাতনের কয়েক দিন পর আমাকে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনার পর আমার মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জেগে ওঠে। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় বিভিন্ন সময়ে নানা বেশ ধারণ করে প্রতিশোধে নেমে পড়ি।"

৩.৩ একাত্তরের রণাঙ্গনে কাঁকন বিবির জীবন

১৯৭১ সালে কাঁকন বিবির বয়স ছিল ৪৪ বছর। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় ৫ নং সেক্টরের লক্ষীপুর ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অপারেশনে কখনো ছদ্মবেশে তথ্য আহরণ আবার কখনো সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[৬২] উল্লেখ্য, সুনামগঞ্জ-সিলেট অঞ্চলটি ছিল পাঁচ নম্বর সেক্টরের অধীন। এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন লে. কর্ণেল মীর শওকত আলী। কাঁকন বিবি যে গ্রামে থাকতেন, তাঁর পাশেই মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। আবার এই ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরেই ছিল পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। যা স্থানীয়ভাবে টেংরা ক্যাম্প নামে

---

[৬০] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৪ মার্চ, ২০১৬।

[৬১] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):* **কাঁকন বিবি**, প্রাগুক্ত।

[৬২] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: কাঁকাত হেননিঞতা,লক্ষীপুর, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
সংগ্রাহক: ঢাকা রিসার্চডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (RDC), ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬।

পরিচিত ছিল। মুক্তিবাহিনীর যে ক্যাম্প ছিল তাঁর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন শহীদ মিয়া। মীর শওকত আলী একদিন ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। তিনি ঐ সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকার একজন সাহসী নারীর প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, দেশকে স্বাধীন করতে একজন সাহসী নারী প্রয়োজন। তখন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা কাঁকন বিবির নাম প্রস্তাব করেন। কারণ কাঁকন বিবির প্রথম স্বামী যেহেতু পাকিস্তানি ক্যাম্পে কাজ করেন, সুতরাং তাঁর পক্ষেই সম্ভব সেখানকার খবর এনে মুক্তিবাহিনীর কাছে প্রেরণ করা। তাই, তাঁরা কাঁকন বিবির সন্ধানে যায়। পথিমধ্যে, মুক্তিবাহিনীর সাথে কাঁকন বিবির দেখা। মুক্তিবাহিনী তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কোথায় যাও?'-উত্তরে কাঁকন বিবি বলে,'স্বামীকে খুঁজতে'। মুক্তিবাহিনী বলে আমাদের সাথে আসো, আমরা নিয়ে যাব। তাঁরা তাদের কমান্ডার লে.কর্ণেল মীর শওকত আলীর কাছে কাঁকন বিবিকে নিয়ে যায়।

লে. কর্ণেল মীর শওকত আলী কাঁকন বিবিকে বলে,

"বোন বসো, চা-বিস্কুট খাও"

চা-বিস্কুট খাওয়ার পর তিনি কাঁকন বিবিকে বলে,

> "বোন তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি তো পাকিস্তান ক্যাম্পে স্বামীকে খুঁজতে যাও, এরপর গেলে সেখান থেকে আমাদের খবর এনে দিবা। আমরা দেশ আর দেশের জনগণের জন্য যুদ্ধ করছি। যেখানে, তুমি মরলে আমরা মরব। আর তুমি বাঁচলে আমরা বাঁচব।"[৬৩]

অর্থাৎ, তাঁরা কাঁকন বিবিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করেন। তাঁরা পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থেকে খবর সংগ্রহের জন্য কাঁকন বিবিকে উৎসাহিত করেন। কাঁকন বিবিও উৎসাহ নিয়ে দেশের জন্য কিছু একটা করতে পারবেন এই ভেবে রাজি হয়ে যান। এরপর, মীর শওকত আলী কাঁকন বিবিকে গোয়েন্দাবৃত্তির কাজের ধরন বুঝিয়ে বলেন।[৬৪]

[৬৩] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):*কাঁকন বিবি, প্রাগুক্ত।

[৬৪] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):*কাঁকন বিবি, প্রাগুক্ত।

ইতোমধ্যে, তাঁর ভগ্নিপতি খুশি কমান্ডারকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে ফেলে। পিতার মতো স্নেহ দিয়ে যে লোকটি তাঁকে বড় করে তুলেছিল, সেই খুশি কমান্ডারকে এক দিন পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ভারত থেকে যেসব মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে আসে তাঁদের তিনি সহযোগিতা করেন। স্থানীয় রাজাকাররাই পাকিস্তানি ক্যাম্পে গিয়ে এ তথ্য জানায়। খুশি কমান্ডারকে পরে হত্যা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ঐ ঘটনায় কাঁকন বিবি খুবই কষ্ট পান এবং প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেন। নিজের জীবনকেও তখন তাঁর কাছে একেবারে তুচ্ছ মনে হয়। তিনি ভাবতে থাকেন কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করা যায়, কীভাবে এ দেশ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে বিতাড়িত করা যায়।[৬৫]

৩.৩.১ তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান

কাঁকন বিবি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন একজন 'তথ্য সংগ্রাহক' হিসেবে। যাঁর কাজ ছিল পাকিস্তানি ক্যাম্পে ঢুকে তাদের হাতিয়ারের ধরন, সংখ্যা ও সৈনিকদের অবস্থান সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা। এক্ষেত্রে, তিনি নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে একটি ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় পরে একদিন দিনের বেলায় ভিক্ষা করতে করতে রওনা দেন টেংরাটিলা ক্যাম্পের দিকে। এলাকার লোকজনদের অনেকেই তখন শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে গেছে। ফলে তাকে খুব বেশি কেউ চিনতে পারল না। প্রথমে টেংরাটিলা ক্যাম্পের বাইরে কয়েকটি বাড়িতে ভিক্ষা করেন। এরপর, কৌশলে একসময় ঢুকে পড়েন টেংরাটিলার পাকিস্তান ক্যাম্পের ভেতর। ভিক্ষা চান পাকিস্তানি মিলিটারিদের কাছেই। তারা কিছু ময়দা ও আটা ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা করার পাশাপাশি তিনি স্বামী আবদুল মজিদ খানের খোঁজও করেন। নানা কায়দায় কিছুক্ষণ ক্যাম্পের ভেতর অবস্থান করে সবকিছু দেখার চেষ্টা করেন এবং প্রথমবার তিনি খুব ভালোভাবেই তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। টেংরাটিলা ক্যাম্পে সৈনিকদের অবস্থান সম্পর্কে তিনি যা দেখেছেন তার বিবরণ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মীর শওকত আলীর কাছে প্রকাশ করেন। মুক্তিবাহিনী তখন সেই অনুযায়ী তাঁদের অপারেশন চালায় এবং তাঁরা সফল হয়।[৬৬]

পরবর্তীতে, কাঁকন বিবি একই কায়দায় টেংরাটিলা ক্যাম্পে প্রবেশ করেন। তখন ক্যাম্পের একটি ঘরে কয়েকজন মেয়েকেও দেখতে পান। মেয়েরা ছিল ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। কাঁকন বিবির বুঝতে বাকি থাকল না এদের ধরে নিয়ে আসা হয়েছে এবং শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। দ্বিতীয় দিন তিনি যখন মিলিটারির কাছে

[৬৫] *প্রতিদিনের সংবাদ*, প্রাগুক্ত।
[৬৬] *প্রতিদিনের সংবাদ*, প্রাগুক্ত।

তাঁর স্বামীর খবর জানতে চান, তখনই তাঁকে আটক করে ফেলা হয়। কয়েকজন পাকিস্থান সেনাবাহিনীর সদস্য মিলে চালায় শারীরিক নির্যাতন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত কাঁকন বিবি যে একজন 'ইনফরমার', এটা তারা ভাবতে পারেনি। নির্যাতন শেষে তারা কাঁকন বিবিকে ছেড়ে দেয়।[৬৭]

এ ঘটনার পর তিনি কিছুদিন আর টেংরাটিলা ক্যাম্পে যাননি। টেংরাটিলা ক্যাম্পে 'ইনফরমার' হিসেবে কাজ করেছেন কাঁকন বিবি, এ খবর জানা মাত্রই দ্বিতীয় স্বামী শাহেদ আলী রেগে তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করেন। একপর্যায়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন 'নষ্টা মেয়ে' বলে। একমাত্র মেয়ে সখিনা বিবিকে শাহেদ আলী নিজের কাছেই রেখে দিলেন।

কাঁকন বিবি এখন একেবারে গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন। কোথাও যাওয়ার তাঁর কোনো জায়গা রইল না। দ্বিতীয়বারের মতো ভেঙে গেল তাঁর সংসার। শাহেদ আলী ঐ সময় আবার বিয়ে করেন।[৬৮]

এরপর, কাঁকন বিবি 'ইনফরমার' হিসেবে কাজ করার জন্য যান সুনামগঞ্জে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে। সেখান থেকে যান সিলেট ক্যাম্পে। পরে যান গোবিন্দগঞ্জ, জাউয়া বাজার ক্যাম্পে। সব জায়গাতেই তাঁর একই কাজ ক্যাম্পের অবস্থান, সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্র সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসা। যেতেন সেই ভিক্ষুকের বেশেই। পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে খোঁজ করতেন নিজের প্রথম স্বামীর। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে রাখে কে কার খবর! পাকিস্তানি সৈন্যরা কাঁকন বিবিকে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালাতো।

কাঁকন বিবিকে নির্যাতনের একপর্যায়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড় অফিসার এলো সেখানে, সে এসে দেখে কাঁকন বিবি অজ্ঞান। অফিসার ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিলেন। পরে, কাঁকন বিবির জ্ঞান ফেরে। তারপর, তাকে কিছু খাবারও দেওয়া হলো। কিন্তু তাঁর আর খাওয়ার মতো সামর্থ্যও ছিল না। উরুতে যে গরম লোহার শিক ঢোকানো হয়েছে তাঁর যন্ত্রণায় তিনি সবকিছু অন্ধকার দেখছেন।

---

[৬৭] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):* কাঁকন বিবি, প্রাগুক্ত।

[৬৮] তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের যুদ্ধকথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ১৩-১৬।

অফিসার তাঁকে জিজ্ঞেস করল,
কেন তুমি ক্যাম্পে যাও?
কাঁকন বিবি অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলেন, 'স্বামীর খোঁজে।'

তারপর, জিজ্ঞেস করল,

তোমার স্বামীর নাম কি?

কাঁকন বিবি বললেন, আবদুল মজিদ খান।

এরপর, আবার জিজ্ঞেস করল,

তোমার স্বামী কোথায় থাকে?

কাঁকন বিবি বললেন, সিলেটে।

এরপর, আর কিছু বলতে পারেননি কাঁকন বিবি। আবার তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। অফিসার তখন ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সিলেটে ওয়্যারলেস করে। সেখানে সত্যিকার অর্থেই আবদুল মজিদ খান নামে কোনো সৈনিক আছে কি না?- তা জানার জন্য। আবদুল মজিদ খান তখন সিলেটেই ছিলেন। কিন্তু তিনি ক্যাম্পের বাইরে ছিলেন।
আব্দুল মজিদ খান ক্যাম্পে আসার সঙ্গে সঙ্গে অফিসার তাঁর সঙ্গে কথা বলে।
অফিসার মজিদ খানের কাছে জানতে চায়, কাঁঠালবাড়িতে তাঁর কী কোনো স্ত্রী আছে?
আব্দুল মজিদ খান জানাল, কাঁকন বিবি নামে তাঁর স্ত্রী কাঁঠালবাড়িতে থাকে এবং সে খাসিয়া উপজাতি। অফিসার মজিদ খানের কাছ থেকে এ তথ্য পাওয়ার পর কাঁকন বিবিকে আর কোনো অত্যাচার করেনি বরং তাঁকে ছেড়ে দেন।[৬৯]

ছেড়ে দিলেও কাঁকন বিবির অবস্থা তখন করুণ। তাঁর যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। তাকে নেওয়ারও কেউ নেই। রাস্তাতেই অসুস্থ শরীর নিয়ে পড়ে রইলেন। পরে অবশ্য লোকজন তাকে ধরাধরি করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, তাঁর সঙ্গে আর কোনো দিন স্বামী মজিদ খানের দেখা হয়নি, দেখা না হলেও ঐ মজিদ খানের কারণেই কাঁকন বিবি সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন।

[৬৯] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):* কাঁকন বিবি, প্রাগুক্ত।

৩.৩.২গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ

মুক্তিযুদ্ধের ৫ নং সেক্টর হেডকোয়াটার্স ছিল সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার বাংলাবাজার ইউনিয়নের বাঁশতলা গ্রামে। ঐ এলাকাটি ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়ঘেরা। ঐ সেক্টরের কয়েকটি ক্যাম্প ছিল সেখানে। বাংলাবাজার ছিল ডিফেন্স ক্যাম্প। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মূল ক্যাম্প ছিল টেংরাটিলা আর অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল রসরাই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান জেনে মুক্তিযোদ্ধারা কাঁকন বিবিকে মনোনীত করেন। তিনি স্বীয় দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। এরপর, তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সহযোদ্ধাদের খাবারের ব্যবস্থা, অস্ত্র সরবরাহ, রেকি করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এক্ষেত্রে, কাঁকন বিবি বলেন যে[৭০],

> "জুলাই মাসে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করি। এ সময় দেখা হয় মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলীর সঙ্গে। তিনি আমাকে মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর শওকতের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। মীর শওকতই আমাকে গুপ্তচরের দায়িত্ব দেন। সাহসিকতার সাথে গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করে সবার আস্থা অর্জন করি। আমি ভিখারির বেশে ঘুরে ঘুরে শত্রুবাহিনীর খবর পোঁছে দিতাম মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। তারপর, তাঁরা আমার খবরের ভিত্তিতে অপারেশন চালাতেন। গুপ্তচরের কাজ করতে গিয়ে দোয়ারাবাজার উপজেলার বাংলাবাজার এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে আবার ধরা পড়ি। শুরু হয় আবার অত্যাচার। একনাগাড়ে সাতদিন অমানুষিক নির্যাতন চালায়। লোহার রড গরম করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছ্যাঁকা দেয়। নির্যাতন শেষে একদিন মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। পরদিন জ্ঞান ফিরে এলে মুমূর্ষ অবস্থায় আমাকে বালাট সাব-সেক্টরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা করানোর পর কিছুটা সুস্থ হয়ে আবার বাংলাবাজারে ফিরে আসি। মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলীর কাছে আবার অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষণ নেই। মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলীর দলে মুক্তি সদস্য হিসেবে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পাই।[৭১]

[৭০] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: কাঁকাত হেননিঞতা, প্রাগুক্ত।

[৭১] জোবায়েদা নাসরিন, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য নারী*, শব্দশৈলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ২৪।

৩.৩.৪ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলীসহ আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কাঁকন বিবি সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের জাউয়া ব্রিজ অপারেশনে যান। পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল 'যয়ার দক্ষিণ দিয়া'। পথে পড়ে একটি শীর্ণ নদী। এক্ষেত্রে, তাঁরা কলা গাছ কেটে ভেলা বানিয়ে, দুই থেকে তিন জন করে পার হয় নদীটি। তারপর, তাঁরা শত্রু ক্যাম্প দখল করার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। একটি গ্রুপ অবস্থান নেয় ব্রিজের কাছাকাছি, অন্য গ্রুপ পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প নিকটবর্তী স্থানে অতর্কিত হামলা চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী ছুটে আসার আগেই মুক্তিযোদ্ধারা বোমা মেরে গুড়িয়ে দেন সেই ব্রিজ, ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভাঙ্গা ব্রিজ দেখে ফিরে যায়। শুরু হয় দুই দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর দুই রাত ও একদিন সামনা-সামনি যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর গোলা-বারুদ শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনীরা মুক্তিবাহিনীর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। সেখানে তাঁরা সফল হন।[৭২]

এ সম্পর্কে কাঁকন বিবি বলেন যে,

> "আমরা এক পর্যায়ে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে থাকি ও পাকিস্তানি বাহিনীদেরকে ঘিরে ফেলি। এক সৈন্য হঠাৎ করে আমাকে দেখে চিনে ফেলে এবং বলে ওঠে, এতো সেই মহিলা! আগেই আমার মনে হয়েছিল এই মহিলা মুক্তিবাহিনীর লোক।[৭৩]

এরপর, ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে পাহাড় ঘেরা টেংরাটিলায় অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তিনি শত্রু সেনাদের বিপক্ষে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। ঐ যুদ্ধে তাঁর ডান পা গুলিবিদ্ধ হয়। ডান উরুর সেই ক্ষত আজীবন তিনি ধারণ করেছেন।[৭৪]

টেংরাটিলা যুদ্ধের পর আমবাড়ি, বাংলাবাজার, টিবলাই, বালিউড়া, মহব্বতপুর, বেতুরা, দুর্বিনটিলা, আধারটিলাসহ বিভিন্ন সম্মুখ যুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন। আমবাড়ি বাজার যুদ্ধের সময় তাঁর পা আবার গুলিবিদ্ধ হয়। সে চিহ্ন ও তিনি আজীবন ধারণ করেছেন ।"[৭৫]

---

[৭২] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):* কাঁকন বিবি, প্রাগুক্ত।

[৭৩] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* কাঁকন বিবি, এ্যাডভোকেট বজলুল মজিদ চৌধুরী (সংগ্রাহক), ০৪ আগস্ট, ২০১৩।

[৭৪] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):* কাঁকন বিবি, প্রাগুক্ত।

[৭৫] বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান, *গেরিলা নারী: নারী মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ৪১।

৩.৪ একাত্তর পরবর্তী জীবন

দেশ স্বাধীন হলে কাঁকন বিবি দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের ঝিরাগাঁও গ্রামে এক ব্যক্তির কুঁড়ে ঘরের বারান্দায় মেয়ে সখিনাসহ আশ্রয় নেন। এরপরের প্রায় ২ যুগ তিনি ছিলেন সবার চোখের অন্তরালে। স্বাধীনতার ২৫ বছর পর, ১৯৯৬ সালে সাংবাদিক রনেন্দ্র তালুকদার পিংকু তাঁকে ভিক্ষারত অবস্থায় খুঁজে পান। এরপর, দেশব্যাপী এই বীর নারীকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে এক একর খাস জমি দান করেন। সিলেটের তৎকালীন সময়ের মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান তাঁকে ঐ জায়গায় একটি ছোট ঘর নির্মাণ করে দেন। মৃত্যু অবধি তিনি ঐ জমিতেই ছোট্ট ঘরে বসবাস করতেন। একমাত্র মেয়ে সখিনা বিবি ও মেয়ের জামাই রফিক মিয়াকে নিয়েই ছিলো তাঁর সংসার। এরপরের কয়েক বছর মোটামুটি ভাল কাটলেও পরবর্তীকালে তিনি অর্থাভাবে নিয়মিত চিকিৎসা করাতেও পারেননি। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করার ঘোষণা দেন। কিন্তু আজও তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি।[৭৬]

কীভাবে তিনি একাত্তর পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন?

সে সম্পর্কে কাঁকন বিবি বলেন,

> "দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের ঝিরাগাঁও গ্রামে একটি পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে আশ্রয় নেই। সামাজিক কারণে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলাম প্রায় দুই যুগ। এর মধ্যে একদিন আমার দুরবস্থা সংবাদপত্রে আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আমাকে এক একর খাসজমি প্রদান করেন এবং আমাকে বীরপ্রতীক উপাধির ঘোষণা দেন। সিলেটের মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান আমাকে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত জায়গায় একটি ছোট ঘর নির্মাণ করে দেন। প্রধানমন্ত্রী দেওয়া সরকারি এই জায়গা পেতে গিয়েও আমাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তৎকালীন তহশীলদার শামসুল হুদা সোহেল মায়ের মমতায় আমাকে এই জায়গার কাগজপত্র ঠিক করে দেন। পরবর্তীকালে, দৈনিক জনকণ্ঠ আমাকে প্রতিমাসে পাঁচ

[৭৬] *Women news 24.com,* 2 April, 2021.

হাজার টাকা করে অনুদান দেয়। কয়েক বছর ভালোই কাটছিল, কিন্তু ২০০৭ সালের প্রথম দিকে সে ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে আবার দুর্বিষহ জীবন শুরু হয়।[৭৭]

সুনামগঞ্জের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট বজলুল মজিদ চৌধুরী খসরু বলেন যে[৭৮],

"কাঁকন বিবি একজন আদিবাসী হয়েও মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে অংশ নিয়ে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তিনি জীবদ্দশায় মুক্তিযোদ্ধা খেতাবপ্রাপ্ত হয়ে কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও বীরপ্রতীক হিসেবে কোনো সুযোগ-সুবিধা পাননি- এটা তাঁর জীবনের একটা বড় অপ্রাপ্তি হিসেবেই রয়ে গেল।"

অ্যাডভোকেট বজলুল মজিদ চৌধুরী আরও বলেন যে,

"কাঁকন বিবির মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সার্টিফিকেটে বীরপ্রতীক খেতাবযুক্ত আছে। তাঁর মৃত্যুর পর, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে দেয়া শোক বার্তায় তাঁকে বীরপ্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু, দীর্ঘ ২৫ বছরের মধ্যে তাঁকে বীরপ্রতীক হিসেবে গেজেটভুক্ত না করা দুঃখজনক। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারের কাছে আমার জোর দাবি, কাঁকন বিবিকে বীরপ্রতীক হিসেবে দ্রুত গেজেটভুক্ত করে তাঁর প্রাপ্য সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়া হোক। যাতে করে তাঁর সন্তানরা তা ভোগ করতে পারে। তিনি এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।"

৩.৫ আত্মোপলব্ধি

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গৌরবের বিষয় দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা। মহান মুক্তিযুদ্ধে এই ভূমিকা পালনের মাধ্যমে যাঁরা এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁরাই সেই গৌরবের অংশীদার।

[৭৭] *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৮।

[৭৮] *যুগান্তর*, প্রাগুক্ত।

স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে কাঁকন বিবি বলেন,

> "আমার একটি মেয়ে আছে, নাম সখিনা। কোনো পুত্র সন্তান নেই। তাই বাঙালি সকল তরুণই আমার সন্তান। আমি বিশ্বাস করি, তারাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। কারণ তারা মাকে সম্মান করতে জানে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক, আমি মনে-প্রাণে এটি চাই।"[৭৯]

কাঁকন বিবি আরও বলেন,

> "মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাঁরা সময়ের পরীক্ষিত সন্তান। রাজাকার, আলবদর, আল-শামস এরা স্বাধীনতার বিরোধী ও দেশের শত্রু। এই শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানান।"[৮০]

তিনি আরো বলেন,

> "মুক্তিযুদ্ধের সময় ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাদের খবর পৌঁছে দিতাম। ঐ সময় রাজাকার, আলবদরদের ঘৃণ্য তৎপরতা ও নির্যাতন দেখেছি ও সয়েছি। রাজাকার, আলবদররা পাকিস্তানি সেনাদেরকে বাঙালির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে এবং মানুষ হত্যা করেছে। মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি করেছে। সেই অপমান, গণহত্যা এবং দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সময় এসেছে। রাজাকারদের বিচার এখন সময়ের দাবি। আমি রাজাকারদের ফাঁসি চাই। এবার তাঁদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা বেঁচে গেলেও এই যুদ্ধে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত করতে হবে।"[৮১]

---

[৭৯] বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান, *গেরিলা নারী: নারী মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ৪০।

[৮০] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার: কাঁকন বিবি*, প্রাগুক্ত।

[৮১] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার: কাঁকন বিবি*, প্রাগুক্ত।

৩.৬ শেষ জীবন

কাঁকন বিবি ব্রেন স্ট্রোক করে ২০১৭ সালের ২১ জুলাই ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেন। পরবর্তীতে, ২০১৮ সালের ২০ মার্চ আবার গুরুতর অসুস্থাবস্থায় ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। ২১ মার্চ বুধবার রাত ১১ টা ৫ মিনিটে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বীর এই মুক্তিযোদ্ধার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।[৮২]
সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের ঝিরাগাঁও গ্রামে খাইবার নদীর পাশে তাঁর নিজ বাড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হয় ।

এক্ষেত্রে, কাঁকন বিবির মেয়ে সখিনা বেগম জানান যে,

> ‘তাঁর মা বেশ কিছুদিন ধরেই নানা শারীরিক রোগে ভুগছিলেন। গত সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। পরে রাত নয়টায় তাঁকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল রাত ১১টায় তিনি মারা যান।’

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের (আইসিইউ) বিভাগীয় প্রধান সব্যসাচী রায় জানান যে,

> ‘কাঁকন বিবি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।’[৮৩]

সুনামগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধ চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের আহ্বায়ক, মুক্তিযোদ্ধা বজলুল মজিদ চৌধুরী জানান যে[৮৪],

> ‘কাঁকন বিবির মৃত দেহ ২২ মার্চ বেলা একটায় সিলেট থেকে তাঁর গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এরপর, জেলা প্রশাসক মোঃ সাবিরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মোঃ বরকতুল্লাহ খান, জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, উপজেলা প্রশাসন, আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বেলা তিনটার দিকে গ্রামের মাঠে তাঁকে গার্ড অব অনারসহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। এরপর তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

[৮২] *Women news 24.com*, 2 April, 2021.
[৮৩] *প্রথম আলো*, প্রাগুক্ত।
[৮৪] *প্রথম আলো*, ২২ মার্চ, ২০১৮।

সুনামগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধ চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের আহ্বায়ক বজলুল মজিদ চৌধুরী আরও জানান যে[৮৫],

'কাঁকন বিবি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খবর সংগ্রহ করে দিতেন। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অস্ত্র হাতে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি একবার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। এ সময় তাঁকে চরম অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে হয়।'

দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী (বীরপ্রতীক) জানান যে[৮৬],

'কাঁকন বিবি ছিলেন খাসিয়া সম্প্রদায়ের লোক। এলাকায় তাঁর পরিচিতি ছিল 'খাসিয়া মুক্তি বেটি' হিসেবে। তাঁর স্বামী আবদুল মজিদ খান ইপিআর সদস্য ছিলেন। তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এরপর, স্বামীর খোঁজ করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুরের বিভিন্ন অপারেশনে কাঁকন বিবি মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য দিতেন। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি কোনো স্বীকৃতি পাননি। পারিবারিক টানাপোড়নে তিনি শ্রমজীবীর কাজ এবং ভিক্ষাবৃত্তি করেছেন। ১৯৯৭ সালে তাঁর বীরত্বগাঁথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেলে তাঁকে ঢাকায় ডেকে নেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তখন সংবর্ধনা দিয়ে তাঁকে বিশেষ 'বীরপ্রতীক' ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু বিষয়টি এখনো গেজেটভুক্ত হয়নি।'

সুনামগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডের সাবেক কমান্ডার হাজী নূরুল মোমেন বলেন যে[৮৭],

"কাঁকন বিবি আমাদের গর্ব। তিনি একাত্তরে জীবনবাজি রেখে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তিনি সুনামগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চিরবিদায়ে আমরা শোকাহত। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে সুনামগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড থেকে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হবে।"

বীরপ্রতীক হিসেবে গেজেট ভুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে,

"কাঁকন বিবি বীরপ্রতীক হিসেবে স্বীকৃত ছিল। তবে গেজেটভুক্ত না হওয়ায় সে জীবদ্দশায় এর কোনো ফ্যাসিলিটি পায়নি।"

---

[৮৫] ঐ।
[৮৬] ঐ।
[৮৭] যুগান্তর, প্রাগুক্ত।

তিনি আরও বলেন,

> "কাঁকন বিবি শিশু কন্যাসন্তান সখিনাকে রেখে যুদ্ধে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপক্ষে মুক্তিবাহিনীর হয়ে শুধু গুপ্তচর হিসেবেই কাজ করেননি, করেছেন সম্মুখ যুদ্ধও। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে বীরপ্রতীক খেতাব দেওয়া হয়। অথচ, খেতাব পেয়েও খেতাবের সুযোগ-সুবিধা না পাওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক। জীবদ্দশায় এ সুযোগ-সুবিধা তাঁর প্রাপ্য ছিল। আমরা সুনামগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বারবার সংশ্লিষ্ট দফতরে তাগিদ দিয়েছি কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর ফলাফল এনে দিতে পারিনি। তিনি অবিলম্বে তাঁর পরিবারকে বীরপ্রতীকের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ করে দিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।"

মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবির মেয়ে সখিনা বলেন যে,

> "আমার মা দেশের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন সে জন্য আমরা গর্ববোধ করি। কাঁকন বিবির মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিতে নিজেকে অনেক সম্মানিত মনে হয়। আমার আফসোস, সরকার স্বীকৃত বীরপ্রতীক খেতাব আমার মা দেখে যেতে পারেননি, ভোগ করে যেতে পারেননি। তাঁর জীবদ্দশায় এটা বাস্তবায়িত হলে তিনি অনেক খুশি হতেন। তিনি সবার কাছে তাঁর মায়ের জন্য দোয়া কামনা করেন।"[৮৮]

৩.৭ পরিশেষ

যুগে যুগে নারীরা দেশের স্বার্থে সংগ্রাম করেছেন। বিভিন্ন আন্দোলনে পুরুষদের সাথে অংশ নিয়েছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম-নীতি ও উদ্যোক্তার অভাবে ইতিহাসে তাঁদের নাম যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়নি। খাসিয়া মুক্তিবেটি কাঁকন বিবিও হারিয়ে যেতেন কালের পাতা থেকে। সুনামঞ্জের দৈনিক পত্রিকা ' দৈনিক মুক্তকণ্ঠে' কাঁকন বিবিকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখা হয়েছিল। প্রগতি সংঘ ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সংগ্রামী নারী বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা মহিলা ক্যাম্প গোবরার মুক্তিযোদ্ধা নারীদের একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। এরই ধারাবাহিকতায়, ১২ ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

[৮৮] ঐ।

থেকে একাত্তর পর্যন্ত সংগ্রামী নারীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ইতিহাস উপেক্ষিত এই বীর নারীর পরিচয় সেদিন উঠে আসে। এরপর, ১৯৯৮ সালের ৬ ডিসেম্বর, নারী প্রগতি সংঘ মুক্তিযুদ্ধে বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানার্থে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাঁরাই প্রথম এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

এরই ধারাবাহিকতায়, কাঁকন বিবি গুণীজন ও প্রতিভা সম্মান ১৯৯৮ পুরস্কার অর্জন করেন। পুরস্কারের জন্য যখন কাঁকন বিবির নাম ঘোষণা করা হয় তখন উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে উঠে করতালির মাধ্যমে তাঁকে সম্মান জানান এবং তিনি প্রতিভা পুরস্কার ২৫০০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন।[৮৯]

পরবর্তীকালে, ২০০৯ সালে কাঁকন বিবিকে জনতা ব্যাংক ১৫ লাখ টাকার অনুদান দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে জনতা ব্যাংকের অনুদানের চেক কাঁকন বিবির হাতে তুলে দেন।[৯০] অনুদানের অর্থ জনতা ব্যাংক এফডিআর করে দেওয়ার পাশাপাশি চার কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেন।

২০০৬ সালে ভারতের সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য কাঁকন বিবিকে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ' সম্মাননা প্রদান করেন। এই সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধাকে ২০১০ সালে জাতীয় দৈনিক কালের কণ্ঠ কর্তৃক সম্মাননা দেওয়া হয়।

শেষত বলা যায়, একাত্তরের পরবর্তী সময়ে তিনি সামাজিক নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। কাঁকন বিবির ন্যায় অন্যতম আরেকজন নারী মুক্তিযোদ্ধা হলেন হেমায়েত বাহিনীর মহিলা গ্রুপ কমান্ডার আশালতা বৈদ্য। তাঁর কথা পরবর্তী অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

[৮৯] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

[৯০] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৯।

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য

অধ্যায়-৪
মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য

৪.১ আশালতা বৈদ্য

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তদ্রূপ, মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য হেমায়েত বাহিনীর মহিলা মুক্তিযোদ্ধা দলের গ্রুপ-কমান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের বিপক্ষে ৮ ও ৯ নং সেক্টরের কোটালীপাড়া সীমানার সাব-সেক্টর কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনের হেমায়েত বাহিনীতে যোগদান করেন এবং সাহসিকতার পরিচয় দেন।[৯১] উল্লেখ্য, বীরমুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবী আশালতা বৈদ্য বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিনের অধীনে ৪৫ জন সাহসী নারীকে সংগঠিত করে একটি মহিলা গেরিলা বাহিনীর গঠন এবং নেতৃত্ব দেন।
এক্ষেত্রে, তিনি একাধিক যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ঘাঘর, কলাবাড়ি, বাঁশবাড়িয়া, হরিণাহাটি, রামশীল এবং পয়সারহাটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ।[৯২]

৪.২ জন্ম ও বেড়ে ওঠা

আশালতা বৈদ্য গোপলগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার লাটেঙ্গা গ্রামের প্রভাবশালী বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিপদ বৈদ্য। তিনি ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন আদর্শ শিক্ষক। মাতার নাম শ্রী সরলাময়ী বৈদ্য। তিনি ছিলেন গৃহিণী। তাঁর ঠাকুরদাদার নাম ছিল কৈলাস বৈদ্য। তিনি ঐ এলাকার একজন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন। তবে, পরিবারটি ছিল সামাজিক দিক থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বিশেষত, তাঁদের একান্নবর্তী পরিবারে ছেলেদের অনেক কদর করা হত আর মেয়েদের অবহেলা করা হত।

আশালতা বৈদ্য একান্নবর্তী ঐ পরিবারে মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করায়, জন্মের পরপরই অবহেলার শিকার হন। জন্মের পর আঁতুরঘরে সন্ধ্যায় হারিকেন জ্বালাতে দেয়নি তাঁর ঠাকুরমা আর জেঠি। পরিবারে ছেলেদের অন্নপ্রাসন অনুষ্ঠান এবং জন্মকুষ্ঠী সযত্নে সংরক্ষণ করা থাকলেও, মেয়ে হিসেবে জন্ম নেওয়া আশালতা বৈদ্যের ক্ষেত্রে

[৯১] *The Daily Star*, 26 March, 2017.
[৯২] *সাক্ষাৎকার:* আশালতা বৈদ্য, মুক্তিযুদ্ধের মহিলা কমান্ডার, ২২/দিলকুশা/ সূর্যমুখী সংস্থা/ মতিঝিল, তারিখ: ১২ মার্চ, ২০২২। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- প্রফেসর ড .মেসবাহ কামাল, মো. মামুন-অর-রশিদ এবং লাবনী ইসলাম চুমকী।

হিন্দুধর্মের কোন রীতিই পালিত হয়নি। সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ ১৯৫৬ সালের ১২ফ্রেব্রুয়ারি। কিন্তু প্রকৃত জন্ম তারিখ তিনি জানেন না। অনুমান করেন, সার্টিফিকেট থেকে তিনি ৩/৪ বছরের বড় হবেন। তাঁর ডাকনাম বাবা রাখেন আশা, তার সাথে বিশেষণ যোগ করেন লতা আর পৈতৃক পদবি বৈদ্য। পুরো নাম হয় আশালতা বৈদ্য। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাই বোন। বড় ছিলেন শান্তিলতা বৈদ্য, মেজ ছিলেন আশালতা বৈদ্য, তারপর ঊষা লতা বৈদ্য। পরপর, তিন মেয়ের জন্ম হওয়ায় তাঁর মাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর ঠাকুরমা আর জেঠি তাঁর মাকে বলেছে, তাঁর মায়ের মুখ দেখে বের হলে নাকি যাত্রা শুভ হবে না। অমঙ্গল হবে। কারণ- তাঁর মায়ের শুধু মেয়ে। এরপর, তাঁর মায়ের অনেক সাধনায় ছেলে সন্তান জন্ম হয়। নাম রাখেন- হরগোবিন্দ বৈদ্য(তাপস), এরপর, সাবিত্রী বৈদ্য ও ঋষিকেষ বৈদ্য(মানস) জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ, চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে আশালতা বৈদ্য ছিলেন দ্বিতীয়।[৯৩]

৪.২.১ প্রাথমিক শিক্ষা

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের হাতেই। তিনি মায়ের হাতেই প্রথম খাড়াপাতা (তালপাতায় লিখিত বর্ণমালা)-এর উপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেখা শেখেন। এক্ষেত্রে, বাবা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কলম আর মা রান্নার পর কাঠের কয়লাকে একটা পদ্ধতিতে কালি বানিয়ে দিতেন।

এরপর, আখাড়াপাতা (তালপাতায় নিজে নিজে অক্ষর দেওয়া) শেখেন।

তারপর, পাঠশালা ও গৃহশিক্ষক হিসেবে মহানন্দ বাড়ুই- এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে, তিনি নারিকেলবাড়ি মিশনারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[৯৪]

৪.২.২ রাজনৈতিক জীবন

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে তিনি প্রথম প্রতিবাদ করেন। তাঁর সহপাঠি ও কাছের বান্ধবী ছিলেন কুসুম বাগচী। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র ছাত্রী। মিশনারী স্কুলের নিয়ম ছিল মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বেতন দিতে হবে। স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষক বাসুদেব রায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন আদায় করছিলেন। কুসুম বাগচী বেতন দিতে না পারায়, তাকে শিক্ষক বাসুদেব রায় ক্লাস থেকে বের করে দেন। আশালতা বৈদ্য কুসুম বাগচীকে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া ইস্যুতে প্রতিবাদ করেন।

---

[৯৩] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

[৯৪] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

আশালতা বৈদ্য ক্লাসের বাকী সহপাঠিদের বলেন,

‘ যেহেতু কুসুমকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছে,

সেহেতু আমি ক্লাস করব না।

তোমরা কি ক্লাস করবে?’

বাকিরা একই কথা বলল। তারপর, ঘটনাটি ক্লাস টু থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। ক্লাস টেন-এর রেণু ভূষণ বাড়ুই ঐ প্রতিবাদকে সমর্থন করেন। একপর্যায়ে, প্রতিবাদটি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটি ঘটনাটির সমাধান করেন। কমিটি সিদ্ধান্ত দেন- দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হবে না। তবে, তাদের বদলা হিসেবে মিশনারীদের ফসল কেটে দিতে হবে। যাইহোক, কুসুমসহ সকল দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা বিনা বেতনে শ্রমের বিনিময়ে পড়াশোনার সুযোগ পেল।

আশালতা বৈদ্য বলেন, এটি ছিল তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কাজ।[৯৫]

এই ঘটনাটি ছিল-বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে যে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী মনোভাব এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহসিকতা ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ।

পরবর্তীকালে, স্কুল জীবনেই ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হয়। আর, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। তিনি তখন ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। বয়সে ছোট হলেও তিনি নিয়মিত ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ছেলেদের সাথে মিছিলে যেতেন। তিনি রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন।

কিভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে?

-এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আশালতা বৈদ্য স্বীকারোক্তি দেন যে,[৯৬]

> “১৯৬৯ সালে কারাগার থেকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গোপালগঞ্জে আসেন। তখন আমি নারিকেলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। ঐ অনুষ্ঠানে আমিই একমাত্র মেয়ে ছিলাম, যে মঞ্চে উঠে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে আয়োজিত সমাবেশে বক্তৃতা করেছিলাম। অন্য কোন মেয়ে বা মহিলা যেটা করতে পারেনি। বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের ঘাঘর এসে পৌঁছালেন। তিনি দূর থেকে মাইকে আমার

[৯৫] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

[৯৬] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

বক্তৃতা শুনছিলেন এবং আমার বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। মঞ্চে উপস্থিত হয়েই আমাকে খুঁজলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন যে, 'ঘাঘর থেকে একটা কোকিল কণ্ঠের বক্তৃতা শুনছিলাম, সেই কোকিলটা কই? কথাটা সবাইকে অবাক করল। স্থানীয় নেতা কর্মীরা আমাকে ডাকলেন। মামুনি এই দিকে আস। আমার কদর বেড়ে গেল। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন।

এরপর, বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন?

আর কি কিছু বলবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, বলব।

তিনি বললেন ঠিক আছে, তুমি যা পার বল।

তারপর, আমি বক্তৃতা করলাম আর মাইক্রোফোন ছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। সেই ঘটনা আমাকে ব্যাপক খ্যাতি এনে দিল এবং গোপালগঞ্জের রাজনীতিতে আমি পরিচিত হয়ে উঠলাম।"

অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর হাতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি ঘটে। এরপর, তিনি নিয়মিতভাবে গোপালগঞ্জের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

৪.৩ একাত্তরের রণাঙ্গনে আশালতা বৈদ্য

মুক্তিযুদ্ধের সময় আশালতা বৈদ্য ছিলেন এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। ১৯৭১ সালের ০৮ মার্চ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে ধানক্ষেতে কর্মরত কৃষকদের রেডিওতে তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭-ই মার্চের ভাষণ শুনেন। যা তাঁর মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করে। তিনি যুদ্ধে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞবদ্ধ হন।

তিনি তাঁর দিদিকে বললেন যে[৯৭],

"এখন স্কুল বন্ধ। স্কুলে আর যেতে হবে না।

বঙ্গবন্ধু বলেছে- যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে।"

[৯৭] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

তারপর, তাঁরা স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। এভাবে ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। হঠাৎ ২৫ মার্চের ভয়াবহ ঐতিহাসিক ঘটনা রেডিওতে শুনতে পান। ২৫ মার্চের পর থেকে ঐ এলাকার হিন্দু জনগোষ্ঠী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আশেপাশের অধিকাংশ হিন্দু পরিবার নৌকায় করে বরিশাল রুট দিয়ে ভারতে চলে যান। এভাবে মার্চ-এপ্রিল মাস কেটে গেল। তাঁর ও তাঁর পরিবারের আর ভারতে যাওয়া হল না। তিনি পরিবারের সাথে যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়মিত রেডিও-তে শুনতেন।

যুদ্ধ শুরু হলে একদিন রাজাকাররা তাঁর বাবা হরিপদ বৈদ্যর কাছে ছয় লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয় তারা। হরিপদ বৈদ্য মেয়েদের বাঁচাতে সপরিবারে ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আশালতা রাজি ছিল না। তিনি যুদ্ধে যোগ দেয়ার সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন।[৯৮]

এমন অবস্থায় তিনি মে মাসে মেজর হেমায়েত উদ্দিনের নাম জানতে পারেন। যিনি মুক্তিযুদ্ধের জন্য বাহিনী গঠন করছেন। হঠাৎ মে মাসের এক গভীর রাতে আশালতা বৈদ্যের বাড়িতে মেজর হেমায়েত উদ্দিন আসেন।

মেজর হেমায়েত উদ্দিন আশালতা বৈদ্যের বাবাকে বলেন যে[৯৯],

"ছেলে হোক বা মেয়ে হোক আমাকে একটি সন্তান দিতে হবে।"

এ কথা শুনার পর একবাক্যে আশালতা বৈদ্য মুক্তিযুদ্ধে যেতে রাজি হলেন।

তখন মেজর হেমায়েত উদ্দিন বললেন,

" কাল সকালে ৪০-৪৫ জন মেয়ে গুছিয়ে লেবুবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে চলে আসবি। পারবি তো?"

আশালতা বৈদ্য বললেন, "হ্যাঁ পারব।"

পরেরদিন আশালতা বৈদ্য ৪৫-৪৬ জন মেয়ে গুছিয়ে লেবুবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে গেলেন। পথিমধ্যে, খুলনা থেকে আগত ডাঃ ফিলিপস এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে আগত নার্স ডলি রাণি বাড়ুই -এর সাথে দেখা। তাঁরা

[৯৮] ঐ।

[৯৯] ঐ।

সবাই অপেক্ষা করলেন। তখন কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন, কমলেশ বৈদ্যক এবং ফরিদপুর থেকে বাবুল আক্তার আসেন। তাঁরা বললেন,

"তোমরা যুদ্ধে যাবা?

তোমরা কিন্তু বাঁচবে না।

রাজি?"

তাঁরা সকলেই একসাথে বললেন, ' হ্যাঁ, রাজি।'

তারপর, শুরু হল মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ।[১০০]

৪.৩.১ মহিলা গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান

আশালতা বৈদ্য প্রশিক্ষণ থেকে গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। মূলত, প্রশিক্ষণকালীন দক্ষতা, নৈপুণ্য, সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিন তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন।

এক্ষেত্রে, আশালতা বৈদ্য স্বীকারোক্তি দেন যে[১০১],

"প্রথম ট্রেনিং ছিল আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিং সেবা প্রদান। এক্ষেত্রে, মাদারীপুর থেকে আগত ডাঃ শ্যামাচরণ বৈদ্য (এমবিবিএস)-এর সন্নিকটে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়। ৫০ জন নারীসদস্য স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ নেন।

প্রথম দিন, ইনজেকশন প্রদান। এক্ষেত্রে, একজন আরেকজনকে ভিটামিন ইনজেকশন প্রদান করে।

দ্বিতীয় দিন, ব্যান্ডেজ করা শেখানো হয়। কেটে গেলে কীভাবে ব্যান্ডেজ করতে হয় সেই ইস্যুতে আশালতা বৈদ্য নিজের হাত নিজেই কেটে ফেলেন। যা ডাঃ ফিলিপসকে অবাক করে।

পরের দিন, বিভিন্ন মেডিকেল যন্ত্রপাতি আনা হয়।

এক সপ্তাহ পর, ফলোআপে আসেন কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন।

কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন ডাঃ ফিলিপসকে জিজ্ঞেস করেন,

"আমার মেয়েরা প্রশিক্ষণের কতদূর শিখেছে?"

[১০০] ঐ।

[১০১] ঐ।

ডাঃ ফিলিপস প্রত্যুত্তরে বলেন,

"আপনার মেয়েরা খুব মনোযোগী আর সাহসী।
মিশনারী স্কুলের মেয়ে বলে কথা, সবাই পারে।"

কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন খুশি হলেন।

এরপর, আশালতা বৈদ্য বলেন,

"ভাই, এই সেলাই শিখলে তো যুদ্ধ হবে না। অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিবেন না।"

কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন বলেন,

"হ্যাঁ, দিব। সব প্রশিক্ষণ দিব"

তারপর, অস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়।৪৫ জন নারীসদস্য অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন।

প্রথমত, বাঁশের সাহায্যে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তাঁরা বাঁশ দিয়ে ক্রলিং করা আয়ত্ত্ব করে। পাশাপাশি, তীর ধনুক দিয়ে ফায়ারিং প্রশিক্ষণ দেন। কীভাবে টার্গেট চিহ্নিত করে গুলি ছুড়তে হয় তাঁর প্রাকটিস সবাই তীর-ধনুক দিয়ে করতে থাকে।

ষষ্ঠ দিনের মাথায় পাঁচটি রাইফেল নিয়ে হেমায়েত উদ্দিন আসেন।

তারপর, হেমায়েত উদ্দিন বলেন,

"তোমরা কে কে রাইফেল ট্রেনিং নিবা?"[১০২]

এক্ষেত্রে, আশালতা বৈদ্য স্বীকারোক্তি দেন যে,[১০৩]

> "আমি সবার ছোট কিন্তু সবার আগে। তারপর, আমরা পাঁচটি রাইফেল নিয়ে ৪৫ জন ট্রেনিং নিলাম। শেখার পর এক মাস তের দিন পর জুনের মাঝামাঝিতে এসে আমাদের গেরিলা যুদ্ধের পরীক্ষা হল। কীভাবে গুলি ছুড়তে হয়? এবং কীভাবে রাইফেল ছিনিয়ে নিতে হয়? পরীক্ষায় সবার কাছ থেকে রাইফেল নিলেও আমার কাছ থেকে নিতে পারেনি। রাইফেলসহ আমি যখন সবার সামনে গেলাম তখন ফরিদপুরের বাবুল আখতার বললেন, তুই হবি টিম লিডার। হেমায়েত উদ্দিন বললেন, ও হবে মহিলা গ্রুপ কমান্ডার। এভাবে আমি মহিলা গ্রুপ কমান্ডারের স্বীকৃতি অর্জন করলাম।"

[১০২] *সাক্ষাৎকার*:আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

[১০৩] *সাক্ষাৎকার*:আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

পরবর্তীতে, তিনি ও তাঁর মহিলা বাহিনী হেরেরকান্দি ও লেবু বাড়ি প্রাইমারি স্কুলে গেরিলা যুদ্ধ কৌশলের প্রশিক্ষণ নেন।[১০৪]

এরপর, তিনি কোটালিপাড়া নারিকেলবাড়ি হাই স্কুলে নারী-পুরুষ সম্মিলিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তারপর, তিনি ভাঙ্গার হাট স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন।

এরপর, সুইসাইড স্কোয়াড প্রশিক্ষণ নেন জহুরকান্দি স্কুলে।

সর্বমোট তিন মাসের প্রশিক্ষণ নেন। এই প্রশিক্ষণ থেকে তিনি ফার্স্ট এইড প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দাবৃত্তির কৌশল, রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড ও বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেন।[১০৫]

৪.৩.২ একাত্তরের রণাঙ্গনে বিভিন্ন অপারেশন

তিনি যুদ্ধকৌশলের উপর পরিপূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইতোমধ্যে, চতুর্দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আশেপাশের গ্রাম- হাজরা বাড়ি, লাখিরপাড়, ঝাঁটিয়া, বাঁশবাড়িয়া, কোটালীপাড়া, ঘাঘর, কলাবাড়ি, হরিণাহাটি, উত্তর পাড়সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে মেয়েরা প্রশিক্ষণ নিতে আসে। সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০ জন। হেমায়েত বাহিনী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাঁর বাহিনীকে ৭ টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। যেমন-

- প্রশাসনিক বিভাগ
- বিচার বিভাগ
- খাদ্য সংগ্রহ বিভাগ
- অস্ত্র সংগ্রহ বিভাগ
- প্রশিক্ষণ বিভাগ
- স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ
- গেরিলা বিভাগ

[১০৪] রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, প্রথম প্রকাশ (আইইডি), ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ১৪১।
[১০৫] *উইমেন নিউজ* ২৪, ১৫ মার্চ, ২০২১।

আশালতা বৈদ্য তাঁর নারী গ্রুপের ৩৫০ জন নারী সদস্যকে সক্ষমতা অনুযায়ী ৭টি বিভাগে ভাগ করে দেন। অন্যদিকে, গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে আশালতা বৈদ্য ছিলেন সকল বিভাগের সক্রিয় সদস্য।[১০৬]

মূলত, তিনি নিয়মিতগেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। কোথায় কীভাবে কোন অপারেশন হবে? তা আগের দিন কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন নির্ধারণ করতেন। হেমায়েত বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে ছিল টাবুরি/ছই নৌকা। পূর্ব-নির্দেশনা অনুযায়ী, ঐ নৌকায় করে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও গেরিলা বিভাগ গেরিলা অপারেশনের জন্য রওনা হত। পথিমধ্যে, তাঁদের সহায়তা করত ছোট ছোট বাচ্চারা। তাঁরা ৩ টি জায়গায় তথ্য সরবরাহের কাজ করত।

- গেরিলা বাহিনীর চিঠি নিয়ে কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনকে দিত।
- কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনের চিঠি নিয়ে গেরিলা বাহিনীকে দিত।
- জহুরকান্দি ট্রেনিং সেন্টারে তাদের যাওয়ার জন্য চিঠি পৌঁছে দিত।[১০৭]

❖ প্রথম অপারেশন-ঘাঘর যুদ্ধ

জুলাই মাসের শুরুতে সংঘটিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী বনাম হেমায়েত বাহিনীর যুদ্ধটি ছিল ঘাঘর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর পুরুষ সদস্যের সাথে ১২ জন সশস্ত্র নারীও ১০ জন সেবিকা নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে, ১২ জন সশস্ত্র নারী সদস্যরা ছিলেন- আশালতা বৈদ্য, সুষমা রাণি জয়ধর, পুষ্প রাণি বাড়ুই, কুসুম বাগচী, সুরমা রাণি বাড়ুই, মিনতি বিশ্বাস, অনিতা বিশ্বাস, নমিতা বিশ্বাস,স্বর্ণলতা রায়, স্বর্ণলতা ফলিয়া, কণক লতা ফলিয়া, উৎপলা বণিক (উঝা)। তাঁরা ঘাঘর ইউনিয়নের কইখা গ্রামের শৈলদাহ নদীর দুইপাশে অবস্থান নেয়। নদী দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কইখা গ্রামে ঢুকলেই তাঁরা অতর্কিতভাবে নদীর দুই পাশ থেকেই অনবরত গুলি ছুড়তে থাকে। ফলে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পিছু হটে। আর হেমায়েত বাহিনী শৈলদাহ নদীর পাশে যে খাদ্য গুদাম ছিল, সেই খাদ্য গুদামের সকল খাদ্য লুট করে।

[১০৬] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

[১০৭] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

❖ কলাবাড়ির যুদ্ধ

কলাবাড়ির যুদ্ধ জুলাই মাসের শেষের দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বনাম হেমায়েত বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও হেমায়েত বাহিনীর পুরুষ সদস্যের সাথে ১১ জন সশস্ত্র নারী ও ১০ জন সেবিকা নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন- আশালতা বৈদ্য, সুষমা রাণি জয়ধর, পুষ্প রাণি বাড়ুই, কুসুম বাগচী, সুরমা রাণি বাড়ুই, মিনতি বিশ্বাস, অনিতা বিশ্বাস, নমিতা বিশ্বাস,স্বর্ণলতা রায়, কণক লতা ফলিয়া, উৎপলা বণিক (উঝা)। তাঁরা খেঁজুর বাড়ি গ্রামের শৈলদাহ নদীর দুইপাশে অবস্থান নেয়। নদী দিয়ে লঞ্চে করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আসে আর তাদের পেছনে ডিঙ্গি নৌকায় ছিল শত শত রাজাকার বাহিনী। তাঁরা গ্রামে ঢুকেই স্থানীয় সকল বাড়িতে আগুন দেয়, লুট করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে হেমায়েত বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষপর্যায়ে, হেমায়েত বাহিনী পাকিস্তানিদের লঞ্চ ডুবিয়ে দিতে সমর্থ হয়। লঞ্চে যতসংখ্যক পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছিল তার প্রত্যেকেই নিহত হয়।

❖ রামশীল-পয়সারহাট যুদ্ধ

তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ছিল রামশীল নদীর পাড়ে সেপ্টেম্বর মাসে। মূলত, এটি ছিল কলাবাড়ির যুদ্ধের বিপরীতে প্রতিশোধমূলক বৃহত্তর পর্যায়ে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণ। অপেক্ষাকৃত বড় লঞ্চে পাকিস্তানি বাহিনী আর ডিঙ্গি নৌকায় করে কয়েক হাজার রাজাকার বাহিনী অপারেশনে আসে। হেমায়েত বাহিনী তা প্রতিরোধ করে। এ যুদ্ধে আশালতা বৈদ্যসহ ১২ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। ৩ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে জয় লাভ করেছিল হেমায়েত বাহিনী। রাজাকার ও শতাধিক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে তাঁরা সেদিন পরাজিত করেছিল।

এক্ষেত্রে, তিনি স্বীকারোক্তি দেন যে[১০৮],

> "আমরা পয়সারহাটে আড়িয়াল খাঁ নদীর উভয় তীরে খনন করা বাঙ্কারগুলোতে অবস্থান নিয়েছিলাম। তুমুল আকারে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। কেউই প্রাণে বাঁচব না, এই মনোভাব নিয়েই সবাই যুদ্ধ করতে থাকে। হেমায়েত বাহিনীর কমান্ডার হেমায়েত ভাই গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর মুখের একপাশ দিয়ে গুলি লেগে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। অন্যদিকে, আমাদের আক্রমণে পাকিস্তান বাহিনীর বিশাল লঞ্চ এবং তাদের সহযোগী স্থানীয়

[১০৮] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।

রাজাকার ধ্বংস হয়ে যায়। এক্ষেত্রে, শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। হেমায়েত বাহিনী পাকিস্তান আর্মির লঞ্চ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সাথে থাকা রাজাকারদের (সহযোগী) নৌকাগুলোর উপর ব্রাশ ফায়ার করা হয়। নদীতেই তাদের সকলের সলিল সমাধি হয়।"

❖ বঙ্গবন্ধু মা-বাবা উদ্ধারের অপারেশন

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মা-বাবাকে তাঁদের স্বীয় বাড়িতে বন্দি করে রেখেছিলো। ঘটনাটি হেমায়েত বাহিনী জানতে পেরে অপারেশনে যায়। তাঁরা গেরিলা অভিযান চালিয়ে বঙ্গবন্ধুর মা-বাবাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেন। ঐ অপারেশনে আশালতা বৈদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১০৯]

৪.৪ একাত্তর পরবর্তী জীবন

৪.৪.১ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসন

দেশ স্বাধীন পরবর্তী সময়ে সমগ্র দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। জনসাধারণের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, দোকান, অফিস সবকিছু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত। ঐ সময় একটি দল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসনের কাজ করেছিল। আশালতা বৈদ্য সেই দলে যোগ দেন।[১১০]

৪.৪.২ শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন

দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি আবার পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি ১৯৭২ সালে নারিকেলবাড়ি মিশনারী স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৭৩ সালে বরিশাল মহিলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ

[১০৯] *The Daily Star*, 26 March, 2017.

[১১০] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, মুক্তিযুদ্ধের মহিলা কমান্ডার, ২২/দিলকুশা/ সূর্যমুখী সংস্থা/ মতিঝিল, তারিখ: ০৫ জুন, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী ও মামুন-অর-রশিদ।

থেকে অনার্স ও ১৯৭৮ সালে মাস্টার্স পাস করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবিবাহিত। জনগণের সেবা করাই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য।[১১১]

৪.৪.৩ কর্মজীবন ও সমাজসেবা

তিনি ১৯৮০'র দশকে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে তোলেন সমবায় প্রতিষ্ঠান 'সূর্যমুখী সংস্থা'। যা তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সাহায্য করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- কৃষি সমবায় এবং ছোট ব্যবসার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সংগঠিত করা। এছাড়া, তিনি নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা এবং পরিবেশগত সমস্যায় ঋণ সহায়তার বিষয়ে কাজ করছেন। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে কাজ করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সক্রিয়তা থেকে দুই লক্ষেরও বেশি পরিবার উপকৃত হয়েছে।[১১২]

৪.৪.৩ পুরস্কার

আশালতা বৈদ্যকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁর কর্মজীবন ও সমাজসেবার উপর স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বিভিন্ন পুরস্কারও সম্মাননা অর্জন করেছেন। উল্লেখযোগ্য কিছু পুরস্কার হল:

- ২০২১-সংগ্রামী সফল নারী (সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য), visionary positive Bangladesh.
- ২০১৬- মাদার তেরেসা পদক, আলবেনিয়া।
- ২০১৬- স্বর্ণপদক, গুণীজন সম্মাননা প্রদান, আমিন জুয়েলার্স।
- ২০০৮-রোকেয়া পদক, অক্সফাম, বাংলাদেশ।
- ২০০৬- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নারী ব্যক্তিত্ব, স্কয়ার, বাংলাদেশ।
- ২০০৫- শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার বাছাই কমিটিতে প্রস্তাবিত ১০০০ জন নারীর মধ্যে একজন মনোয়ন।
- ১৯৮৩- জাতীয় পুরস্কার 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায়ী' হিসেবে।
- ১৯৭১- স্বাধীনতা যুদ্ধে মহিলা গ্রুপ কমান্ডার- ৭১ এর হেমায়েত বাহিনী।[১১৩]

---

[১১১] ঐ।

[১১২] ঐ।

[১১৩] *সাক্ষাৎকার:* আশালতা বৈদ্য, মুক্তিযুদ্ধের মহিলা কমান্ডার, ২২/দিলকুশা/ সূর্যমুখী সংস্থা/ মতিঝিল, ০৫ জুন, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী ও মামুন-অর-রশিদ।

৪.৫ আত্মোপলব্ধি

আশালতা বৈদ্য, জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ব্যক্ত করে বলেন যে,[১১৪]

'মানুষের জন্ম সময়টা একটা যুদ্ধ,
যুদ্ধের মাধ্যমেই একটি জীবনের সূচনা।
আর মৃত্যুর মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি।
মাঝখানের পুরো সময়টা প্রতিটি মানুষ যুদ্ধ করেই তাঁর জীবন অতিবাহিত করছে।
তদ্রূপ, আমি প্রতিটি মুহূর্ত যুদ্ধ করে পার করছি।'

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি সম্পর্কে বলেন যে[১১৫],

> "১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয়টি মাসের প্রতিটি দিন যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। সর্বদা মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা মাথায় কাজ করত। কিন্তু প্রথমদিকে কিছুই করতে পারছিলাম না। কিছুদিন পর হেমায়েত উদ্দিনের কথা শুনলাম। তিনি দল গঠন করছে। মনের মধ্যে একটা স্বপ্ন তৈরি হল। একটা সাহস কাজ করছিল যে ভিয়েতনামীদের মতো কিছু করা যাবে। তারপর, হেমায়েত ভাইয়ের বাহিনীতে যোগ দিলাম। মূলত, আমাদের এলাকা ছিল ৮ এবং ৯ নম্বর সেক্টরের অধীনে। হেমায়েত বাহিনী ছিল আঞ্চলিক বাহিনী। এই বাহিনী গোপালগঞ্জের গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে হেমায়েত বাহিনী অনেক পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেন। আমি হেমায়েত বাহিনীর গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।"

তিনি ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলেন,

> "আমি কখনই সময় নষ্ট করি না। আমি আমার পুরো ছাত্রজীবনে কোনো প্রেমিকের জন্য এক ঘণ্টাও নষ্ট করিনি। বিয়েও করিনি। আমি কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগে বিশ্বাসী।

[১১৪] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, মুক্তিযুদ্ধের মহিলা কমান্ডার, ২২/দিলকুশা/ সূর্যমুখী সংস্থা/ মতিঝিল, ১২ মার্চ, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল, লাবনী ইসলাম চুমকী ও মামুন-অর-রশিদ।

[১১৫] *সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য, মুক্তিযুদ্ধের মহিলা কমান্ডার, ২২/দিলকুশা/ সূর্যমুখী সংস্থা/ মতিঝিল, ০৫ জুন, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী ও মামুন-অর-রশিদ।

তিনি আরও বলেন যে[১১৬],

> "আমরা দরিদ্র গ্রামে নীরবে কাজ করছি, আমরা তখন বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বড় শহরগুলিতে বসবাসরত মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে। কখনও কখনও আমরা নিপীড়ন এবং দারিদ্র্যকে জয় করার জন্য যুদ্ধ করি। তখন আমরা অনুভব করি যে, কেউই পিছিয়ে পড়া মানুষকে পাত্তা দেয় না। তবে, আমরা বুঝতে পারি যে, সবার জন্য সমতাভিত্তিক একটি উন্নত বিশ্বে বাস করার আকাঙ্ক্ষায় আমরা একা নই।"

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রশ্নে তিনি বলেন যে[১১৭],

> "টাকা ও ধনসম্পদের লোভে মুক্তিযুদ্ধ করিনি। দেশের প্রতি মমত্ববোধের কারণেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। বর্তমানে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অনেক ক্ষেত্রেই রাজাকার এখন মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। এই ব্যবস্থার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। তিনি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের অবিলম্বে সনদ বাতিল দাবি করেন। একইসাথে, যেসব প্রকৃত নারী মুক্তিযোদ্ধা এখনো সনদ পাননি, তাঁদের সনদ প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান।"

৪.৬ পরিশেষ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে পুরুষের পাশাপাশি বাংলার নারীরা অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায়, মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ছোটবেলা থেকেই একবারও অত্যাচার এবং দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মাথা নত করেননি। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষারত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপর আরোপিত প্রতিষ্ঠানের বেতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়াশোনার জন্য আন্দোলন করেন এবং সফল হন। প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয় দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন মওকুফ করতে। তিনি জীবনের উপর বার বার ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি হেমায়েত বাহিনীর মহিলা গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মামলার আসামি হন। ২৭ নভেম্বর ১৯৭৫, কোটালিপাড়া থানা আওয়ামী লীগ নেত্রীবৃন্দের সাথে তিনিও গ্রেফতার হন এবং ৯ দিন ফরিদপুর পুলিশ হেফাজতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে আওয়ামী লীগের সক্রিয়

[১১৬] *সাক্ষাৎকার:* আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।
[১১৭] ঐ।

কর্মী হওয়ার অপরাধে বিআরডিবি প্রকল্প কর্মকর্তার চাকুরী হতে বরখাস্ত হন। এরপর, স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে ১৯৮৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সূর্যমুখী সংস্থার অফিস লুট এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৮৪-১৯৮৯ পর্যন্ত সময়কালে তাঁকে ৪২ টি মামলা মোকাবেলা করতে হয়েছে। ২০০১-২০০৭ বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে তাঁকে ২৭ টি মামলার মোকাবেলা করতে হয়েছে।

কিন্তু, কোন কিছুই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি সর্বদা রাজনীতি আর সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে দেশব্যাপী প্রলঙ্কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সেবা করতে তিনি এগিয়ে যান। তাঁর নামে অসংখ্য মামলা আর পদে পদে তৎকালীন সরকারের বাধা থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুরুষের পোশাকে বৈদেশিক ত্রাণ বিতরণ করেন। তাঁর মতো অসংখ্য নারী বাংলার সমাজ ব্যবস্থার উর্ধ্বে গিয়ে প্রয়োজনে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এমন দুইজন পুরুষবেশী নারী মুক্তিযোদ্ধা হলেন শিরিন বানু মিতিল এবং করুনা বেগম। তাঁদের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরুষবেশী সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা

৫.১ শিরিন বানু মিতিল

এবং

৫.২ মুক্তিযোদ্ধা করুনা বেগম

অধ্যায়-৫
স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরুষবেশী সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা

৫.১ মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মিতিল খোন্দকার নামে পরিচিত শিরিন বানু মিতিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একজন পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। কারণ একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের ঐ সময়ের সামাজিক রক্ষণশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি ছিল অবধারিত প্রায়।[১১৮] একজন নারী হয়ে ঐ সময়ের সমাজে সম্মুখ যুদ্ধে যাওয়া ছিল ভীষণ দুঃসাহসিক কাজ। একজন তরুণী মুক্তিযোদ্ধা হয় কিভাবে? এই সঙ্কট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শিরিন বানুকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পুরুষের পোশাক পরে পুরুষবেশে যুদ্ধে যোগ দেবেন। যেন কেউ তাকে চিনতে না পারে। দেশ শত্রু কবলিত। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাবনা প্রবেশ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের আটক করা শুরু করে। তখন একটা আতঙ্ক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, ঘরে বসে বা নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক মন-মানসিকতা তাঁর ছিল না। শিরিন বানু মিতিলের মামা এবং ফুফু সম্পর্কের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রী, তাঁদের দুই ছেলে জিন্দান ও জিঞ্জির বলেছিলেন,[১১৯]

> "তুমি (শিরিন বানু মিতিল) প্রীতিলতার মতো শার্ট প্যান্ট পরে যুদ্ধে যেতে পার।"

ইতোমধ্যে, ২৭ মার্চ পাবনার পুলিশ লাইনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এ যুদ্ধে কাজিনদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তখন তিনি তাঁর ভাইদের প্যান্ট, শার্ট ও জুতা নিলেন। তাঁর চুল আগে থেকে ছাঁটা ছিল ছেলেদের মতো। সুতরাং তাকে দেখে অচেনা কেউ ছেলে হিসেবেই ভেবে নিত। কাজিন জিঞ্জিরের কাছ থেকে মাত্র আধা ঘণ্টায় থ্রি নট থ্রি চালনা শিখে ফেললেন শিরিন বানু মিতিল।[১২০]

অতঃপর, শিরিন বানু মিতিল শার্ট-প্যান্ট পড়ে কিশোর যোদ্ধা সেজে পাবনার পুলিশ লাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১২১]

---

[১১৮] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৫ জুন, ২০২০।

[১১৯] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), চ-২২, মহানন্দা বনানী, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। তারিখ: ০৪ জুন, ২০২২,সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মামুন-অর-রশিদ।

[১২০] *The Daily star*, 22 July, 2016.

[১২১] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), প্রাগুক্ত।

এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, জার্মান তরঙ্গ, ডয়চে ভেলেতে (Deutche Welle), শিরিন বানু মিতিল স্বীকারোক্তি দেন যে[১২২],

> "যখন যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার সাথে যাঁরা ছিল তারা কিন্তু সরাসরি ঐ জায়গাটায় চলে যাচ্ছে। অথচ আমি যেতে পারছি না। তাই যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য তখন আমি জেদ করি ছেলেদের মতো করে ছদ্মবেশ ধারণ করে যুদ্ধে যাব। আমার দুই কাজিন জিন্দান এবং জিঞ্জির -এর সাথে ঘর থেকে বের হয়ে যাই।"

তখন বড় ফুফু (জিন্দান ও জিঞ্জিরের মাতা) তাঁদেরকে বলেছিলেন যে,[১২৩]

> "যুদ্ধে যাচ্ছ যাও। তবে তোমাদের পিঠে যেন গুলি না লাগে।"

কথাগুলো শুধু কতকগুলো কথা নয়, এ যেন আত্মপ্রত্যয়ী, স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার অনুপ্রেরণা। যার উপর ভিত্তি করে তাঁদের দেশপ্রেমের টানে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বাস্তব দৃষ্টান্ত।

এক্ষেত্রে শিরিন বানু মিতিল স্মৃতিচারণ করেন,

> "আমার খালা আমার অভিভাবক ছিলেন। আমি আমার মামাতো ভাইয়ের পোশাক পরে তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'এসো এবং আমার সামনে দাঁড়াও'। আমি তেমন করেছিলাম, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যেতে পারো। তোমাকে মেয়ের মতো লাগছে না।"[১২৪]

৫.১.১ জন্ম ও বেড়ে ওঠা

শিরিন বানু মিতিল ১৯৫০ সালের ২-রা সেপ্টেম্বর পাবনা শহরে তাঁর নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খন্দকার মোহাম্মদ শাহজাহান। তিনি ছিলেন বামপন্থী রাজনীতিবিদ। তিনি ছাত্রজীবনে খিদিরপুর ডকইয়ার্ডে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। মাতার নাম সেলিনা বানু। তিনি ছিলেন বামপন্থী রাজনীতিবিদ এবং

[১২২] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: শিরিন বানু মিতিল, জার্মান রেডিও, ডয়চে ভেলের কাছে প্রদেয়, সংগ্রাহক: জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), চ-২২, মহানন্দা বনানী, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

[১২৩] ঐ।

[১২৪] *The Daily Star*, 22 July, 2016.

শিক্ষাবিদ। তিনি পাবনা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পূর্ব বাংলার আইনসভার সাবেক সদস্য, পাবনা জেলা ন্যাপের সভাপতি এবং পরবর্তী সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। তিনি ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির লঙ্গরখানায় কাজ করেন। খন্দকার মোহাম্মদ শাহজাহান এবং সেলিনা বানু দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে শিরিন বানু মিতিল ছিলেন সবার বড়।[১২৫]

তাঁর মেজ মামা শামসুল হুদা ছিলেন গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নেওয়া শিরিন বানু মিতিলের রাজনীতিতে যোগদান ছোটবেলাতেই।[১২৬] তাঁর মাতা তাকে নীহার কুমার সরকারের 'ছোটদের রাজনীতি' ও 'ছোটদের অর্থনীতি' পড়তে দিয়েছিলেন। যদিও তখন ওই বই পড়া নিষিদ্ধ ছিল।[১২৭]

অর্থাৎ, শিরিন বানু মিতিল উদার ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় পরিবার থেকে এসেছেন। এক্ষেত্রে, শৈশব-কৈশোর কাল থেকে তাঁকে প্রভাবিত করে পিতা, মাতা ও মাতামহ খান বাহাদুর ওয়াসিমউদ্দিন আহমদের রাজনৈতিক আদর্শ। উল্লেখ্য, মাতামহ-এর বাড়িটি ছিল একসময় বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি। তাই শৈশব-কৈশোর কাল থেকেই তিনি ব্যতিক্রমী সমাজ সচেতন তথা রাজনৈতিক মুক্ত চেতনার আবহে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন। স্বভাবতই তিনি গভীর চিন্তা চেতনার প্রগাঢ় দেশপ্রেম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর বোধ ছোট বেলাতেই অর্জন করেন। আর দশটা বালিকার মতো ছক বাধা সহজ সরল সুখী জীবনের চিত্র তিনি লালন করেননি।

এই প্রেক্ষাপটে, তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৬৬ সালে শিরিন বানু মিতিল শৈলরাণী দেবী পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নানুয়া দিঘীর পশ্চিম পাড়, কুমিল্লা থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি পাস করেন। তারপর, তিনি কুমিল্লা মহিলা কলেজে ভর্তি হন। ঐ কলেজ থেকে তিনি ১৯৬৮ সালে এইচ.এস.সি পাস করেন। কলেজ জীবনে তিনি ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সালে কুমিল্লা মহিলা কলেজে অধ্যয়নকালেই বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা আন্দোলনের পক্ষে মিছিল, সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী) এবং শিরিন বানু মিতিল একসাথে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা আন্দোলনসহ বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।[১২৮]

---

[১২৫] *সাক্ষাৎকার:* এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী), সেঞ্চুরি টাওয়ার, মগবাজার, ঢাকা, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মামুন-অর-রশিদ।

[১২৬] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), প্রাগুক্ত।

[১২৭] *The Independent*, 21 July, 2016.

[১২৮] *সাক্ষাৎকার:* এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী), প্রাগুক্ত।

এরপর, তিনি কুমিল্লা থেকে পাবনা চলে যান। সেখানে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বাংলা বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হন। উল্লেখ্য, তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যয়নকালেই ছাত্র ইউনিয়ন পাবনা জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।[১২৯]

তারপর, ১৯৬৮-৬৯ সালে গণ-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন শিরিন বানু মিতিল। পাবনা এবং কুমিল্লা, দুই জায়গাতেই কাজ করতেন তিনি। পারিবারিক কারণেই তাঁকে এই দুই জায়গায় যাতায়াত করতে হতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় শিরিন বানু মিতিল ছিলেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে ছিলেন পাবনা জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী।[১৩০]

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রদের নিয়ে পাবনার ডিসি নুরুল কাদের খানের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। পুলিশ, ইপিআর-দের সহায়তায় পাবনার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়। শিরিন বানু মিতিল ঐ দলে যোগ দেন। একটা পর্যায়ে সিরাজগঞ্জ থেকে এক প্লাটুন সেনাবাহিনী আসে। তাদের সাথে শিরিন বানু মিতিলের দলের সম্মুখ গোলাগুলি হয়। অনেকেই হতাহত হন। সৌভাগ্যক্রমে শিরিন বানু মিতিল বেঁচে যান।[১৩১]

তারপর, তিনি ৯নং সেক্টরের মেজর এম এ জলিলের নেতৃত্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের একটি সংবাদপত্রে তার পরিচয় প্রকাশ করে এবং প্রকাশিত হওয়ার পরে, তাঁর নিরাপত্তার কারণে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে আর যেতে দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে, তিনি ভারতীয় সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে সংগঠিত কার্যক্রমে নিযুক্ত ছিলেন।

এক্ষেত্রে তিনি বলেন, "আমরা নারী বা পুরুষ হিসেবে নয়, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বের কারণে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম।" দেশপ্রেম, দেশপ্রেম আর দেশপ্রেম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।[১৩২]

শিরিন বানু মিতিল মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েও সনদপত্র পাননি। ফলে, তিনি কিছু প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এমনকি, জীবিতাবস্থায় তাঁর ছবি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে থাকলেও, যেহেতু তাঁর সনদ নেই, সেহেতু তিনি

[১২৯] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৫ জুন, ২০২০।

[১৩০] *The Independent,* 21 July, 2016.

[১৩১] *সাক্ষাৎকার:* এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী), প্রাগুক্ত।

[১৩২] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, প্রাগুক্ত।

ইনভাইটেশন কার্ড পাননি। মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল জীবনভর শুধু লড়াই-ই করে গেলেন। মেলেনি কোন যোগ্য রাষ্ট্রীয় সম্মান। যা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য ছিল।[১৩৩]

৫.১.২ একাত্তরের রণাঙ্গনে শিরিন বানু মিতিল

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ায় ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজশাহী থেকে পাবনায় যায়, ক্যাম্প স্থাপন করে, কারফিউ ঘোষণা করে এবং নির্বিচারে লোকজনকে গ্রেফতার করে। সেনাবাহিনী পাবনা ডিসি অফিস ও অন্যান্য স্থাপনায় প্রবেশ করলে স্থানীয় লোকজন পাল্টা গুলি চালায়।[১৩৪]

ক. পাবনার প্রাথমিক প্রতিরোধে পুরুষবেশে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল

পাবনার প্রাথমিক প্রতিরোধ পর্ব চলছিল পঁচিশ মার্চ থেকেই। চলে নয় এপ্রিল নাগাদ। জারি হয় সান্ধ্য আইন। ২৬ মার্চ থেকে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার শুরু হয়। নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন চালায় সাধারণ জনগণকে। অর্থাৎ, সর্বস্তরে অবর্ণনীয় অত্যাচার, গণহত্যা শুরু হয়। জেলা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয় পাল্টা-আঘাত হানার। ২৭ মার্চ রাতে পাবনা পুলিশ লাইনের যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধ রূপ নেয় জনযুদ্ধে। ঘরে ঘরে মেয়েরাও যুদ্ধে নামার কথা ভাবতে শুরু করে। যে যেভাবে পেরেছে নারী-পুরুষ সবাই যুদ্ধে অংশ নেয়। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তা নিয়েই নেমে পড়ে। তাদের অস্ত্র ছিল গরম পানি, অ্যাসিড বাল্ব, বটি আর দা।[১৩৫]

এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, জার্মান তরঙ্গ, ডয়চে ভেলেতে (Deutche Welle), শিরিন বানু মিতিল স্বীকারোক্তি দেন যে[১৩৬],

> "মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তখন খুব বেশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল না, তাই তাঁরা কোচ (একটি মাছ ধরার হাতিয়ার), কিচেন ছুরি, লাঠি এবং বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করেছিল।"[১৩৭]

শিরিন বানু মিতিলের দুই কাজিন জিন্দান ও জিঞ্জির যুদ্ধের ময়দানে রওনা হয় তাঁদের মায়ের নির্দেশে। এই মা তাঁর ছেলেদের বলতেন যে,

---

[১৩৩] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), প্রাগুক্ত।

[১৩৪] *The Independent*, 21 July, 2016.

[১৩৫] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), প্রাগুক্ত।

[১৩৬] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: শিরিন বানু মিতিল, জার্মান রেডিও, ডয়চে ভেলের কাছে প্রদেয়, প্রাগুক্ত।

[১৩৭] ঐ।

‘তোমাদের কী মানুষ করেছি ঘরে থেকে অসহায়ভাবে মরার জন্য?

মরতে হলে যুদ্ধ করতে করতে মরো।’

খ. টেলিফোন ভবনের যুদ্ধ

২৮ মার্চ পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন শিরিন বানু মিতিল। এই যুদ্ধে তিনি একমাত্র নারী ছিলেন। এই যুদ্ধে ৩৬ জন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রত্যেকেই নিহত হয়েছিল। শহীদ হয়েছিলেন দুই মুক্তিযোদ্ধা। শিরিন বানু মিতিলের মতো সংগ্রামী মেয়েদের মানসিকতা ছিল ‘মেরে মরব’।[১৩৮]

তিনি বলেন, “আমি পাবনা টেলিফোন ভবনে যুদ্ধের সম্মুখভাগে ছিলাম,”

এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, জার্মান তরঙ্গ, ডয়চে ভেলেতে (Deutche Welle), শিরিন বানু মিতিল স্বীকারোক্তি দেন যে,[১৩৯]

> “টেলিফোন ভবনে যে যুদ্ধটা ছিল সেই জায়গায় এবং পাবনায় প্রথমদিকে যে মিলিটারি গ্রুপ এসেছিল তাদের সাথে পাবনার জনগণের সংগঠিত সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পাবনায় যত সংখ্যক মিলিটারি গ্রুপ এসেছিল তাদের প্রত্যেকেই নিহত হয়। তাদের আর ফিরে যেতে হয়নি।”

গ. কন্ট্রোল রুম ও অন্যান্য অপারেশন

তারপর, কিছুদিন পাবনা শত্রুমুক্ত ছিল। পরবর্তীতে, ১০ এপ্রিল পর্যন্ত খন্ড খন্ড যুদ্ধ হয়। এই প্রেক্ষাপটে, পাবনার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়। যেখান থেকে প্রতিরোধ করা হত। এক্ষেত্রে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলের সাথে কাজ করেন। ঐ সময় পাবনায়পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যে কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয় সেই জায়গাটাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[১৪০]

---

[১৩৮] মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ২০০০, পৃষ্ঠা: ১২৮।

[১৩৯] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: শিরিন বানু মিতিল, জার্মান রেডিও, ডয়চে ভেলের কাছে প্রদেয়, প্রাগুক্ত।

[১৪০] ঐ।

৯ এপ্রিল পাবনার নগরবাড়ী ঘাটের কাছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। সে সময় কন্ট্রোল রুমের পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয় শিরিন বানু মিতিলকে। এছাড়া, তিনি নগরবাড়ী ঘাট, আতাইকুলা ও কাশীনাথপুরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয় আকাশপথে। পাবনার পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া জেলায় তখন প্রতিরোধ প্রায় ভেঙে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা তখন চুয়াডাঙ্গার দিকে চলে যায়। পাবনার ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ইকবালের দল একটি গাড়িতে করে কুষ্টিয়া হয়ে চুয়াডাঙ্গার দিকে রওনা হয়। গাড়িতে জায়গা না হওয়ায় মিতিল ও তাঁর এক ভাই থেকে যান কুষ্টিয়ায়। পরে কুষ্টিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার সময় ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁদের। কিছুদিন পর ভারতের দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক শ্রী মানস ঘোষ মিতিলের ছবিসহ সাক্ষাৎকার আকাশবাণীতে প্রকাশ করেন। ফলে পুরুষ সেজে আর যুদ্ধ করার সুযোগ পাননি শিরিন বানু মিতিল। এক দিনের ঘটনা শিরিন বানু মিতিলের মনকে আজীবন নাড়া দিয়েছে।

এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, জার্মান তরঙ্গ, ডয়চে ভেলেতে (Deutche Welle), শিরিন বানু মিতিল স্বীকারোক্তি দেন যে,[১৪১]

> "কুষ্টিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাওয়ার পথে আমি যে গ্রুপটার সাথে কাজ করেছি সেই গ্রুপটাকে তখন রাত্র বেলায় বেশ গভীর রাতে শত্রুপক্ষ বিহারী ভেবে প্রতিরোধ করে। আমাদের টিমটাকে সনাক্ত করা হয়। মূলত ওই অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতেই সতর্কতামূলক পাহারায় যারা ছিল তাঁরা আমাদের পরিচয় জানতে চায়। আমরা পরিচয় দিলেও তাঁরা প্রথমে সেটা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না। কারণ আমাদের সঙ্গে যিনি আর আই ছিলেন তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। ফলে তাঁর ভাষার টান ছিল বিহারীদের মতো। তাই আমরা যে সত্যি মুক্তিযোদ্ধা তার প্রমাণ চাইল। তখন পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমাদের একজন বলতে বাধ্য হলো যে, 'আপনারা কি আকাশবাণীতে শিরিন বানুর কথা শুনেছেন?' তাঁরা বলল যে, 'হ্যাঁ, আমরা তাঁর কথা শুনেছি।'
>
> তখন বলা হলো, আমাদের সঙ্গে সেই শিরিন বানু আছে। সেই সময় আমি খুব সন্দিহান ছিলাম যে, এত বড় দলের ভেতরে ছদ্মবেশে একজন মেয়ে আছে, এটাকে তাঁরা হয়তো অন্যভাবে দেখবে। কিন্তু আমার পরিচয় জানার পরেই দেখা গেল, তাঁরা সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। তাঁদের মধ্যে এক বৃদ্ধ পিতা আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'মা

[১৪১] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: শিরিন বানু মিতিল, প্রাগুক্ত।

আমরা আর ভয় করি না। আমাদের মেয়েরা যখন আমাদের সঙ্গে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করছে তখন বিজয় আমাদের হবেই।'

এছাড়া, ডয়চে ভেলের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্যক্ত করেছিলেন শিরিন বানু মিতিল। তাঁর কথাগুলো থেকে আমরা যা পাই–

'আটাশ মার্চ শহরের জেল রোডে টেলিফোন একচেঞ্জ ভবনে দখল নেওয়া ছত্রিশজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের সবাই মারা যায়। দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ৩০ মার্চ পাবনা শহর স্বাধীন হয়। ফলে, সেখান থেকে তিনি চলে যান কুষ্টিয়ার ক্যাম্পে। সেখানে পুলিশের ইনচার্জ ও রাজনৈতিক নেতা আমিনুল ইসলামের সাথে দেখা হয়। গোলাবারুদের অভাবে প্রাথমিক প্রতিরোধ কিছুটা থেমে যায়। ফলে, অস্ত্র আর গোলাবারুদের জন্য একটা দল গঠন করা হয়। শিরিন বানু মিতিল সেই দলের সাথে যোগ দেন। ঐ সময় তিনি জানতে পারেন তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে। তিনি যে ছেলেদের পোশাক পড়ে যুদ্ধ করছেন সেটি প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে তাঁকে ছদ্মবেশ ছেড়ে দিতে হয়। এরপর, তিনি আর ছদ্মবেশে যুদ্ধ করতে পারেননি।'

ঘ. কলকাতার গোবরা ক্যাম্পে শিরিন বানু মিতিল

তারপর, তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে গোবরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান। সেখানে দেখা হয় নাচোল বিদ্রোহের জননী ইলা মিত্রের সাথে। ঐসময় তিনি নাচোল বিদ্রোহের জননী ইলা মিত্রের বাসায় ছিলেন কিছুদিন। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে আলোচনা করে একটি নারী মুক্তিযোদ্ধার দল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে, তাঁরা প্রথমে কলকাতার বিভিন্ন আশ্রয় শিবির ঘুরে ঘুরে ৩৬ জন নারীকে মুক্তিযোদ্ধা দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁদের নিয়ে গোবরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আস্তে আস্তে সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সমস্য ছিল ২৪০ এরও বেশি। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, ঐ সময় কয়েকজন কলকাতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সভা সমাবেশে বক্তব্য দেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালান এবং শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহের কাজ করেন।

পরবর্তীতে, অস্ত্রের অভাব থাকায় নারীদের গ্রুপের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না। তাই, ২৪০ জনের একটি অংশ আগরতলায় যায় মেডিকেল কোরের সদস্য হিসেবে। আরেকটা অংশ বিভিন্ন এলাকায় ভাগ হয়ে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন।[১৪২]

এছাড়া, ভারতের সাংবাদিক মানস ঘোষের লেখায় শিরিন বানু মিতিলের মুক্তিযুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। সাংবাদিক মানস ঘোষ উল্লেখ করেন যে[১৪৩],

> ... 'শিরিনকে আমার অসামান্য লেগেছিল। আমি যশোর, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের খবর যোগাড় করতে গিয়ে প্রচুর মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেছি। কিন্তু কোন তরুণী-নজরে পড়েনি। আমি রোজ অফিসের গাড়ি করে দর্শনা হয়ে চুয়াডাঙ্গা যেতাম। চুয়াডাঙ্গা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পশ্চিমাঞ্চলের সদর দফতর। কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী ছিলেন ওই অঞ্চলের প্রধান। একদিন সেখানে গিয়ে দেখা হলো পাবনার ডিসি বা ডেপুটি কমিশনার নুরুল কাদের খানের সঙ্গে। তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানের (সিএসপি) এক আমলা।... তিনি বললেন, চুয়াডাঙ্গায় তিনি অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ নিতে এসেছেন। কেননা পাকিস্তানি বাহিনী পাল্টা আক্রমণের ছক কষে পাবনা পুনর্দখল করতে চাইছে।...অতঃপর একটা প্রায় অকেজো বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যোগাড় করে তার সঙ্গে দুটো রেলের বগি জুড়ে দিয়ে স্তূপীকৃত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঈশ্বরদীর পথে পাড়ি জমালাম। সে ছিল রুদ্ধশ্বাস পরিক্রমা বা অভিজ্ঞতা।...
>
> ভোর পাঁচটায় যখন ঈশ্বরদী পৌছাই স্টেশনে দেখি প্রচুর মুক্তিযোদ্ধা।... তখনই আমার চোখ পড়ে শিরিনের ওপর। শারীরিকভাবে রফিকুল ইসলাম বকুল বা ইকবালের মতো বলিষ্ঠ মুক্তি সে নয়। বরং সে খুব শীর্ণ ও লাজুক প্রকৃতির। আমার কাছে এসে বলল 'নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।' আমার হাত থেকে প্রায় জোর করে এয়ার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'দামী কিছুই নেই তো?' উত্তর দেয়ার আগেই সে বলে ওঠে, 'যুদ্ধের খবর করতে এত ঝুঁকি নিয়ে আমাদের পাবনায় এসেছেন। আমাদের মেহমানদারি করতে দিন।...' ডিসি আমাদের বকুল, ইকবাল ও শিরিনের হাতে সঁপে দিয়ে কালেক্টরে চলে গেলেন।... পাবনা শহরে বিভিন্ন রণাঙ্গন দেখে কালেক্টরে পৌঁছেই দেখি ডিসি সাহেব উৎকণ্ঠায় তাঁর চেম্বারে পাঁয়চারী করছেন।...'

[১৪২] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* শিরিন বানু মিতিল, জার্মান রেডিও সাংবাদিক ডয়েচ ভেলে কাছে প্রদেয়, সংগ্রাহক: জয়া তাসনিম রহমান, প্রাগুক্ত।
[১৪৩] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), প্রাগুক্ত।

মানস ঘোষের সঙ্গে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে শিরিনের উত্তরে ঐ সাংবাদিক হতবাক হয়ে যান। কারণ- শিরিন বানু মিতিল তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'বাংলার মেয়েরা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্তের উত্তরসূরি। তাঁরা আমাদের যে পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই পথে আমরা চলতে অভ্যস্ত। বঙ্গবন্ধু ঠিকই বলেছেন, বাঙালির জন্য পাকিস্তান হয়নি। সে জন্য শুধু আমি নই, আমার পুরো পরিবার মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করবে।'

মানস ঘোষ আরও লিখেছেন... 'হঠাৎ কালেক্টরেটে ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র দলের উদয় হলো। সকলের হাতে চীনা অটোমেটিক রাইফেল। তার স্বরে তারা চেঁচিয়ে বলছে, 'আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডিসি তাদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে কথা বলুক। তাদের কয়েকজন আকাশে তাক করে কয়েক রাউন্ড গুলিও ছুড়ল। শিরিন একজনকে চিহ্নিত করে বলল, 'ওই লোকটা হচ্ছে টিপু বিশ্বাস। এরা আপনাদের নক্সালদের মতো মাও এর ভক্ত।' হঠাৎ শিরিন ওদের উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে, 'এটা কী এসব করার সময়? আপনারা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, বেঈমানি করেছেন। আপনাদের লজ্জা করে না? বাঙালিরা আপনাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। আপনাদের অভাব অভিযোগ থাকলে ডিসি সাহেবকে স্মারকলিপি দিয়ে যান। কিন্তু ডিসি সাহেব মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তাঁকে অযথা ডিস্টার্ব করবেন না।'... কালেক্টরিতে টিপু বিশ্বাসের উপস্থিতির খবর পেয়ে টান টান উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রফিকুল ও টিপুর লোকেরা একে অপরের দিকে রাইফেল তাক করে অবস্থান নেয়। দুই পক্ষই মারমুখী। তখন অন্য এক শিরিনকে দেখা গেল। কালেক্টরির দোতলা থেকে নেমে সে সোজা দুই পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষকে কালেক্টরি ছেড়ে চলে যেতে বলল। কিন্তু কোন পক্ষ আগে যাবে তা নিয়ে গোল বাধল। ...পাবনার আকাশ হঠাৎ দুটি এক ইঞ্জিনের ছোট বিমানের আবির্ভাবে এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। ডিসি সাহেব কালেক্টরির দোতলার বারান্দা থেকে রফিকুলদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'টিক্কা খান পাঠিয়েছে 'রেকি' করতে। কারণ সে ঢাকা থেকে এক বিশাল বাহিনী সড়কপথে পাঠিয়েছে পাবনা পুনর্দখলের লক্ষ্যে'। সঙ্গে সঙ্গে রফিকুল জানান, আমরা তাহলে নগরবাড়ি ঘাটে গিয়ে হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করি।' ... তখন ঘরে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা। তিনি বললেন,'পাকিস্তান হানাদার বাহিনী পাঁচটি ফেরি করে নগরবাড়ি নেমেছে এবং পাবনা শহরের দিকে আসছে। নগরবাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তারা ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে। আমরা রাইফেল ও মার্টার দিয়ে সামাল দিতে পারছি না।'...

‘এইসময় ডিসি সাহেবের পোর্টেবল ওয়্যারলেসের সেটে খবর আসছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পাবনার দিকে ধেঁয়ে আসছে। ডিসি সিদ্ধান্ত নেন এবার মালপত্র গুটিয়ে কুষ্টিয়ার দিকে যেতে হবে। শিরিনকে রফিকুল ও ইকবালদের হাতে সঁপে দিয়ে পাবনা ছাড়লেন। শিরিনদের জন্যে পদ্মা পার হবার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করে গেলেন। এই পরিস্থিতিতেও শিরিন ছিল অবিচল। বরং সে বলছিল, ‘আপনারা এগোন। আমরা আসছি। এক সঙ্গে পদ্মা পার হওয়া ঠিক কাজ হবে না।’[১৪৪]

৫.১.৩ একাত্তর পরবর্তী জীবন

ক. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসন

দেশ স্বাধীন পরবর্তী সময়ে এক বিভীষিকাময় জীবন শুরু হয়। সমগ্র দেশ তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। জন সাধারণের ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট, দোকান, অফিস সবকিছু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত। ঐ সময় একটি দল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসনের কাজ করেছিল। শিরিন বানু মিতিল সেই দলে যোগ দেন।[১৪৫]

খ. শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন

এরপর, বঙ্গবন্ধু তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমান রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি করে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে পড়তে যাবে। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৩ সালে শিরিন বানু মিতিল তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ায় পড়তে যান।[১৪৬] সেখানকার পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়ায় তিনি নৃবিজ্ঞানে পাঠ সমাপ্ত করে ১৯৮০ সালে দেশে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি মুক্তিযোদ্ধা মাসুদুর রহমানকে রাশিয়ার মস্কোতে অবস্থানকালে বিবাহ করেন। মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল এবংমুক্তিযোদ্ধা মাসুদুর রহমান দম্পতির এক ছেলে এবং দুই মেয়ে। ছেলের নাম তাহসিনুর রহমান। মেয়েদের নাম জয়া তাসনিম রহমান এবং তন্বী নওসীন।[১৪৭]

---

[১৪৪] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৫ জুন, ২০২০।

[১৪৫] *সাক্ষাৎকার:* এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী), প্রাগুক্ত।

[১৪৬] *সাক্ষাৎকার:* এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী), প্রাগুক্ত।

[১৪৭] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), প্রাগুক্ত।

গ. কর্মজীবন ও সমাজসেবা

১৯৮০ সালে ফিরে আসার পর, ১৯৮২ সালে তিনি কুমিল্লায় বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টে যোগ দেন। এরপর, তিনি রোকেয়া কবিরের সংস্থা 'নারী প্রগতি'তে কাজ করেন। তারপর, ১৯৮৬ সালে ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৮৯ সালে প্রিপ ট্রাস্টে কাজ শুরু করেন। মৃত্যু অবধি তিনি 'প্রিপ ট্রাস্ট' নামের এনজিওর পরিচালন হিসেবে এ্যরোমা দত্ত, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ পৌত্রীর সঙ্গে কাজ করেন।[১৪৮]

তিনি নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন। তিনি চাইল্ড অব মাদার কেয়ার নামে একটি সেবা কেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), সেক্যুলার বাংলাদেশ ফোরাম এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সেক্টর কমান্ডার ফোরামের (এসসিএফ) সদস্য ছিলেন।[১৪৯]

কিন্তু, পিআরআইপি ট্রাস্টে একটি শীর্ষস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত এবং প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হওয়া সত্ত্বেও, শিরিন বানু একজন সাধারণ এবং নজিরবিহীন ব্যক্তি ছিলেন যিনি নিজের সম্পর্কে কথা বলতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।[১৫০]

শিরিন বানু রাজনীতিতে এবং তৃণমূল পর্যায়ের নারী নেত্রীদের ক্ষমতায়নে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে নারী আন্দোলনের সাথে তার অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে মিশ্রিত করেছেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের (তৃণমূল আইনসভা ইউনিট) মহিলা নেতৃবৃন্দকে একটি নির্বাচিত মহিলা ফোরামে একত্রিত হতে অনুপ্রাণিত করেছেন যা তাদের অধিকার এবং ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য সম্মিলিতভাবে দর কষাকষি করতে পারে। তিনি মৌলবাদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ বাংলাদেশের নারীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য স্থানীয় নারী গোষ্ঠী তৈরিতেও কাজ করেছেন।[১৫১]

ষাট-এর দশকের মাঝামাঝি তিনি মাতা সেলিনা বানু কুমিল্লার ফরিদা বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। সেখানে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়পাত্রী। তখনও তাঁর মধ্যে সচেতন কল্যাণমুখী চিন্তা চেতনার বিকাশ হচ্ছিল।[১৫২]

---

[১৪৮] *সাক্ষাৎকার:* এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী), প্রাগুক্ত।

[১৪৯] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), প্রাগুক্ত।

[১৫০] *The Independent*, প্রাগুক্ত।

[১৫১] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, প্রাগুক্ত।

[১৫২] *প্রথম আলো*, ১ আগষ্ট, ২০১৬।

শিরিন বানু আরেকটি জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন তা হল বিয়ের বয়স। তিনি পিআরআইপি ট্রাস্টের সাথে একত্রে লড়াই করেছেন যে, বিয়ের বয়স ১৬ বছর কমানো হবে না কারণ এটি সমাজের বড় অংশের দ্বারা প্রস্তাবিত। তিনি বলেছেন যে মহিলা আন্দোলনগুলো এই বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং তাঁরা এর বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করবে।

২০০৫ সালে ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী কমলা ভাসিনের নেতৃত্বে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত সহস্র সংগ্রামী নারীর যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে বাংলাদেশের ষোলজন নারীর মধ্যে শিরিন বানু মিতিলও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৫৩]

শেষত, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশে সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সংগ্রামে সর্বত্র সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন।

৫.১.৪ আত্মোপলব্ধি

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর সার্বিক অভিজ্ঞতার অনুভূতি সম্পর্কে বলেন,

> "মুক্তিসেনা হয়ে সেদিন যুদ্ধ করেছিলাম, ইতিহাসের পাতায় নাম থাকবে সে আশায় নয়, তখন শুধু একটাই লক্ষ্য ছিল আমাদের সামনে, আর তা হল- মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।"[১৫৪]

শিরিন বানু মিতিল একজন যোদ্ধা হয়ে চলেছেন, তিনি স্বীকার করেন যে,

> "কখনও কখনও আমি বিষণ্ন হয়ে পড়ছি, কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রের যোদ্ধা এবং আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যখন একই মনের লোকেদের সাথে কথা বলি তখন তা সাহায্য করে।"

পাশাপাশি, যা তাঁকে আশা দেয় তা হল- তাঁর মতো লোকেরা, তাঁদের প্রজন্মের সাথে, সঠিক কারণের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে।

---

[১৫৩] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, প্রাগুক্ত।

[১৫৪] মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১২৯।

যুদ্ধাপরাধীরা কীভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছিল তা নিয়ে তিনি হতাশ ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বীর নারীযোদ্ধাদের সাথে কীভাবে অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল তা নিয়ে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এই সমস্যাগুলো তাঁকে যে যন্ত্রণা দিয়েছিল তাঁর সাথে তিনি ক্রমাগত লড়াই করেছেন। তিনি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশে নারী অধিকার আন্দোলনে তিনি তাঁর জীবন কাটিয়েছেন। তিনি সত্যিই একজন যোদ্ধা ছিলেন। শেষ অবধি তিনি যা বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর জন্য লড়াই করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের সমাজের বর্তমান বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কঠোর অবস্থান নেন।[১৫৫]

তিনি 'মুক্তির লড়াই এ নারী' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় পুরুষের পাশে থেকে সমান তালে লড়াই করেছেন। কিন্তু বীরাঙ্গনা শব্দের মধ্য দিয়ে নারীদের যোদ্ধার চাইতেও নির্যাতিতা হিসেবেই বেশি বিবেচনা করা হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

এই বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল ধর্মীয় মৌলবাদ যা বর্তমানে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বর্তমান মৌলবাদকে আগের চেয়ে আরও বেশি সংগঠিত এবং আক্রমণাত্মক হিসেবে দেখেন এবং তিনি বলেন যে, 'মাদ্রাসায় ইতোমধ্যেই অনুসারী নিয়োগ শুরু হয়েছে।' তিনি মনে করেন, মৌলবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করা উচিত, কারণ মৌলবাদীরা মুক্তমনা মানুষকে হুমকি দিচ্ছে।

তিনি বলেন, "শুধু রাস্তায় প্রতিবাদ করলেই যথেষ্ট হবে না। তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে খুবই সুসংগঠিত।"[১৫৬]

শিরিন বানু মিতিল যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে খুবই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, অবশেষে ২০১৪ সাল থেকে যুদ্ধাপরাধীর শাস্তি হচ্ছে।

তিনি এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের স্বীকৃতির কথা বলেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থান পায়নি, বিশেষত নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণের কথাই তিনি বলেছেন। বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, অনেক নারী মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার তাঁদের বীরাঙ্গনা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

---

[১৫৬] *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), প্রাগুক্ত।

তিনি বলেন, "ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কীভাবে তাদের গল্প জানবেন যখন আমাদের সমাজ বীরাঙ্গনাদের প্রতি এত বিরূপ? এটা ভালো খবর যে সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমি মনে করি বীরাঙ্গনারা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। যাঁরা দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছেন; তাঁরা সবচেয়ে জঘন্য নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। যুদ্ধ শেষ হলে আমাদের সংগ্রাম শেষ হলেও বীরাঙ্গনাদের সংগ্রাম নতুন মাত্রায় শুরু হয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা নিয়ে লিখতে হলে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং বিষয়গুলোকে ভিন্নভাবে দেখতে হবে। তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে এসে দায়িত্ব না নিলে এটা সম্ভব হবে না।" [১৫৭]

নারীদের অধিকারের বিষয়ে পুরুষদের কীভাবে জড়িত হওয়া উচিত?–এক্ষেত্রে তিনি বলেন, "পুরুষদেরও শেষ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তবে প্রথমেই মহিলাদের তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এজন্য প্রথমে তাঁদের আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। তিনি বলেন, "যখন আমি দেশের মহিলাদের সাথে কাজ করতাম, সেখানে একজন পুরুষ ছিলেন, তাই মহিলারা চুপ করে ছিলেন। এজন্য তাঁদের আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে। কিন্তু আজকাল নারী-পুরুষের যৌথভাবে লড়াই করা উচিত। এখনও অনেক দূর যেতে হবে এবং আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জটিল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তাঁদের জন্য লড়াই করা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন বেড়েছে। ছোটবেলায় আমরা মাঠে খেলতাম, আমাদের মায়েরা এত চিন্তিত ছিলেন না। আজকাল মান ব্যবস্থা কমে গেছে। নারীরা তাঁদের অধিকার চাইলে তাঁরা সহিংসতার শিকার হয়।"[১৫৮]

৫.১.৫ শেষজীবন

মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের কেন্দ্রীয় নেত্রী শিরিন বানু মিতিল ২১ জুলাই ২০১৬ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বুধবার একটি রেস্তোরাঁয় পরিবারের সাথে রাতের খাবার খেয়ে রাত ১০:৪৫ টার দিকে তাঁদের ইন্দিরা রোডের বাসায় ফিরে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসায় কাজ হয়নি। বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজেস-এ রাত ১:৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। রাত দেড়টার দিকে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।[১৫৯] মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে

[১৫৭] *https://daily asian age.com*, 22 July, 2016.

[১৫৮] *The Independent*, 21 July, 2016.

[১৫৯] *The Independent*, প্রাগুক্ত।

সাড়ে ১১টা পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হয় এবং তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। শুক্রবার সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রথম জানাজার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে তাঁকে কুমিল্লায় দাফন করা হয়। সুশীল সমাজের সদস্য, সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশের সেক্টর কমান্ডার ফোরাম (বিএসসিএফ), বাংলাদেশ ছাত্র সংসদ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ কৃষক সমিতি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।[১৬০] শত শত মানুষ বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[১৬১]

৫.২ মুক্তিযোদ্ধা করুণা বেগম

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসংখ্য নারী যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে আবার অনেকেই পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। করুণা বেগম ছিলেন এমনই একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি পুরুষদের পাশাপাশি একজন নারী হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রথম সারিতে সক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৬২] দেশমাতৃকাকে শত্রু মুক্ত করতে মাত্র ১৮ বছর বয়সে অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বদলা নিতে চেয়েছিলেন রাজাকারদের হাতে মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর প্রাণ হারানোর। তিনি ছিলেন ৯-নং সেক্টরের একজন সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধা। তিনি গৌরনদীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিজাম উদ্দিনের অধীনে যুদ্ধ করেছেন। মূলত, তিনি ছদ্মবেশে যুদ্ধে অংশ নিতেন। তিনি একজন ছেলের ন্যায় প্যান্ট-শার্ট ও মাথায় কাপড় পরতেন। তিনি আবার কখনো বধুবেশে, কখনো ভিক্ষুক রূপে গেরিলা আক্রমণের তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করতেন ওই স্কোয়াডের। তিনি অস্ত্র চালানোর পাশাপাশি গ্রেনেডসহ বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন।[১৬৩] ছদ্মবেশে গ্রেনেড ও অন্যান্য বিস্ফোরক নিক্ষেপ করে শত্রু ছাউনিকে বিধ্বস্ত করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল সদর জেলা, কসবা, কাশিমাবাদ, বাটাজোর, নন্দীবাজার, টরকীতে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে করুণা বেগম বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[১৬৪]

---

[১৬০] *Daily asian age*, 22 July 2016.

[১৬১] *The Independent*, 21 July, 2016.

[১৬২] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, শুধুই মুক্তিযুদ্ধ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১০।

[১৬৩] *উইমেন নিউজ ২৪.কম*, ৩ এপ্রিল, ২০২১।

[১৬৪] *ভোরের কাগজ*, ১০ ডিসেম্বর, ২০২০।

৫.২.১ জন্ম ও বেড়ে ওঠা

করুণা বেগম বরিশালের মুলাদী থানার অন্তর্গত পাতারচর গ্রামে ১৯৫৩ সালের ২রা এপ্রিল সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ আলী আহমেদ খন্দকার, যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন এবং ১৯৬০ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে অফিস সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মাতার নাম জোবাইদা বেগম। তিনি একজন গৃহিণী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই করুণা বেগম খুব প্রাণবন্ত, হাস্যোজ্জ্বল এবং কৌতূহলী শিশু ছিলেন। তিনি ছিলেন পরিবারের সবার আদরের পাত্রী। তিনি পাতারচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন। উল্লেখ্য, একই পাতার চর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, তাঁর উপরের এক শ্রেণীতে পড়াশোনা করতেন। ১৯৭১ সালে তাঁর অসাধারণ সাহসিকতার জন্য, তাঁকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বীরত্ব পুরস্কার "বীরশ্রেষ্ঠ" খেতাব প্রদান করা হয়। মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, করুনা বেগম এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা একসাথে খেলাধুলা করতেন।[১৬৫]

পরবর্তীকালে, তিনি পাতার চর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা সম্পন্ন করে মুলাদী মাহমুদজান উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। উল্লেখ্য,পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় করুণা বেগমের মাতা মৃত্যুবরণ করেন। পনের বছর বয়সে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় যখন তিনি মুলাদী স্কুলের ছাত্রী ছিলেন, তখন তাঁর বিয়ে হয় শহীদুল হাসান চুন্নুর সাথে। শহীদুল হাসান চুন্নু তখন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এর সৈনিক ছিলেন। কিন্তু, চাকরিটা তাঁর পছন্দ না থাকাই শীঘ্রই তিনি ঐ চাকরি ছেড়ে কাজিরচর মধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[১৬৬]

করুণা বেগমের স্বামী মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল হাসান ১৯৭১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি চর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ যেখানে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে বাঙালিদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই ৭-ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও দিকনির্দেশা অনুযায়ী তিনি মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন।[১৬৭]

---

[১৬৫] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১০।

[১৬৬] *উইমেন নিউজ ২৪. কম*, প্রাগুক্ত।

[১৬৭] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক,*দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১১।

২৬ শে মার্চ বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, শহিদুল যিনি একজন সৈনিক হিসেবে ভাল প্রশিক্ষিত ছিলেন, তিনি তাঁর গ্রামের যুবকদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং কাছাকাছি থানা এবং আনসার ইউনিট থেকে যতটা সম্ভব অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন। পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠাতেন। নিজেও স্থানীয়ভাবে দল গঠন করে মুলাদী এলাকায় বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক হিসেবে তিনি হয়ে ওঠেন সুপরিচিত। ইতোমধ্যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে স্থানীয় রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়, যাদের সহায়তায় মুলাদী থানায় ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুলাদী থানার নন্দীরবাজার এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার সময় শহীদুল এবং তাঁর দুই সহযোদ্ধা শত্রুদের দ্বারা আহত, বন্দী ও নির্যাতনের শিকার হন। পরবর্তীতে তাঁকে সহ আরও কয়েকজন মুক্তিকামী যুবককে জয়ন্তী নদীর তীরে গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর, নদীতে ফেলে দেয়া হয় তাঁদের লাশ।[১৬৮] স্বামীর অকাল মৃত্যুতে করুণা বেগম অসহায় হয়ে পড়ে। একদিকে স্বামী হারানোর বেদনা অন্যদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের দ্বারা নির্যাতনের আশংকা করুনা বেগমের জীবনকে এক অনিশ্চয়তার সঙ্কটে নিয়ে যায়।

তবে, স্বামী হত্যার পর থেমে যাননি করুণা বেগম। বরং প্রতিশোধের স্পৃহায় জ্বলে ওঠেন। এই সঙ্কট থেকে উত্তোরণের উপায় হিসেবে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে, স্বামী শহীদ হওয়ার একমাস পর তিন বছরের শিশুকে দাদির কাছে রেখে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন করুণা বেগম।[১৬৯]

৫.২.২ একাত্তরের রণাঙ্গনে করুণা বেগম

স্বামীর অকাল এবং বিভীষিকাময় মৃত্যু করুণা বেগমের জন্য একটি বিশাল ধাক্কা ছিল। তারপর থেকে, তিনি এবং তাঁর পরিবার ক্রমাগত আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করতেন, সচেতন ছিলেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে কোনো সময় তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর স্বামী যে কাজটি নিয়েছিল তা

[১৬৮] *উইমেন নিউজ ২৪.কম*, প্রাগুক্ত।

[১৬৯] *সাক্ষাৎকার:* কর্ণেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, স্থান: কলা ভবন, ইতিহাস বিভাগ, ঢা.বি., তারিখ: ৩০ মার্চ, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- প্রফেসর ড.মেসবাহ কামাল এবং লাবনী ইসলাম চুমকী।

তিনি সম্পূর্ণ করবেন। তাই তিনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে মুক্তি সংগ্রামে পুরুষ ছদ্মবেশে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন।[১৭০]

ক. স্বামী হত্যার প্রতিশোধে পুরুষবেশে নারী মুক্তিযোদ্ধা

৩ বছরের শিশু পুত্র মান্নাকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে দাদির কাছে রেখে তিনি গৌরনদী থানার নলচিরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাতের শেষের দিকে তিনি ক্যাম্পে আসেন এবং ক্যাম্প কমান্ডারদের একজন কুতুবুদ্দিনের সাথে দেখা করেন। পাতারচর প্রাইমারি স্কুল এবং মুলাদী হাই স্কুলে কুতুবুদ্দিন করুণার দুই শ্রেণী উপরে পড়তেন। তিনি কমান্ডার কুতুবুদ্দিনের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে স্বামী শহীদুলের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা বলেন এবং স্বামী হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে কমান্ডার কুতুবুদ্দিন তাঁকে চলে যেতে রাজি করার চেষ্টা করেন, এই যুক্তি দিয়ে যে সমস্ত পুরুষ শিবির একজন মহিলার জন্য জায়গা নেই এবং সে তাদের মধ্যে থাকতে এবং সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না। ফলে সেদিন করুণা বেগম চলে যান কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যায় পুরুষদের পোশাক পরে চুল ছোট করে ফিরে আসেন। করুণা বেগম কুতুবুদ্দিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, 'শিবিরের কেউ জানবে না যে, সে একজন মহিলা' এবং তাকে তাঁর প্রশিক্ষণার্থীদের একজন হিসাবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।[১৭১]

খ. অস্ত্র প্রশিক্ষণ

গ্রেনেড, স্টেনগান, রাইফেল এবং অন্যান্য ধরণের বিস্ফোরক কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শেখার পরের দিনই তিনি তাঁর ইউনিটের সাথে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তাঁর আগ্রহ ও অধ্যবসায় অধিনায়কদের বিস্মিত করে তোলে। একইসাথে, তিনি তাঁর দক্ষতা এবং সাহসিকতার মাধমে দ্রুত সহযোদ্ধাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মান উভয়ই অর্জন করেন। মূলত তিনি গ্রেনেড নিক্ষেপে পারদর্শিতা লাভ করেন। ইতোমধ্যে, ঐ এলাকায় নয় জন নারী মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন এবং অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ শুরু করেন, যাদের নেত্রী হিসেবে করুনা বেগম আত্মপ্রকাশ করেন।

[১৭০] *ভোরের কাগজ*, ১০ ডিসেম্বর, ২০২০।
[১৭১] *সাক্ষাৎকার:* কর্ণেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত।

গ. হ্যান্ড গ্রেনেড দক্ষতায় বিভিন্ন অপারেশন

করুনা বেগম প্রশিক্ষণ শেষ করে সক্রিয়ভাবে বরিশালের বামরাইল, কাশিমাবাদ, বাটাজোর, নন্দীরবাজার এবং টরকীসহ বরিশালের বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। প্রত্যেকটিতে তিনি সফলতার পরিচয় দেন। পাশাপাশি, তিনি ছদ্মবেশে শত্রু ছাউনির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তাঁর ইউনিটের জন্য গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বও পালন করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে করুণা বেগমের সাহস এবং যুদ্ধক্ষেত্রে হ্যান্ড গ্রেনেড ব্যবহারে তাঁর নির্ভুলতা ছিল অসাধারণ। কাশিমাবাদ যুদ্ধে তিনি একজন ভিখারিনীর ছদ্মবেশে গ্রেনেড হাতে ব্রিজ এলাকার কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের উপর হামলা করেন। তিনি ঐ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙ্কারের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে যান, চতুরতার সাথে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন এবং দ্রুত নিরাপদে সরে যান। এই যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা মুক্তিবাহিনীর জন্য একটি নিষ্পত্তিমূলক বিজয় এনে দেয়। এই আক্রমণে পাকিস্তানি দশ জন সৈন্য এবং কয়েকজন রাজাকার নিহত হয়।[১৭২]

পরবর্তীকালে, করুণা বেগমকে বরিশাল শহরেও পাঠানো হয় যেখানে তিনি বরিশাল মেডিকেল কলেজের সামনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি চলন্ত ট্রাকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। একইভাবে, ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক মোঃ কুতুবউদ্দিনের নেতৃত্বে বামরাইলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক মোঃ কুতুবউদ্দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন স্বেচ্ছাসেবক আক্রমনের পূর্বে ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রস্তাব করা হলে, মুহূর্তেই করুনা বেগম উক্ত কার্য-সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন করুণা বেগম অবিশ্বাস্য নির্ভুলতার সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙ্কারের কাছে ক্রলিং করে এগিয়ে গিয়ে দুইটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। তাঁর গ্রেনেড নিক্ষেপ করার পর মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত আক্রমন চালিয়ে ঐ স্থান থেকে পাকিস্থানি সৈন্যদের হতাহত করে বিতাড়িত করে আক্রমণ সফল করেন।

১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ঢাকা-বরিশাল সড়কের উপর বাটাজোড়ে অপারেশন চালায়। সেই অপারেশনে করুণা বেগম একইভাবে অবিশ্বাস্য নির্ভুলতার সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ

[১৭২] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১২।

করেন। ফলে, কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্যকে হতাহত করতে সক্ষম হন। তবে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র থাকায় মুক্তিবাহিনীর কাঙ্খিত আক্রমন বিফল হয়।[১৭৩]

এই সমস্ত অপারেশনগুলোর প্রতিটিতে করুনা বেগম সর্বদা স্বেচ্ছায় কাজ করতেন। তিনি সর্বদা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের দলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সদস্য হয়ে ওঠেন। ১৯৭১ সালের ১৫ নভেম্বর ক্যাম্প কমান্ডার কুতুবুদ্দিন তথ্য পেয়ে গৌরনদীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি স্টিল-বডি লঞ্চে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। যখন তাঁর ইউনিট নদীর তীরে অবস্থান করেছিল, তখন করুণা বেগম অন্যদের থেকে এগিয়ে একটি ঝোপের মধ্যে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সৈন্য বোঝাই লঞ্চটি নদীর তীরে পৌঁছালে করুণা বেগম দ্রুত লঞ্চে দুইটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। একই সাথে, তাঁর ইউনিট তাঁদের রাইফেল এবং মর্টার দিয়ে শত্রুদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লঞ্চটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং সেই অপারেশনে মুক্তিবাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য সফলতা আসে।[১৭৪]

ঘ. যুদ্ধাহত নারী মুক্তিযোদ্ধা

করুণা বেগমের শেষ যুদ্ধ ছিল মাহিলারায় ২১শে নভেম্বর, ১৯৭১ সালে। মাহিলারায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল যেখানে তারা নিয়মিতভাবে বেসামরিক লোকদের নির্যাতনের জন্য নিয়ে আসত। করুণা বেগমের ইউনিট মাহিলারা ক্যাম্পে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করে। এটি একটি চাঁদনী রাত ছিল এবং দৃশ্যমানতা বেশ পরিষ্কার ছিল। অন্ধকারের আড়ালে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পের কাছে ব্রিজ সংলগ্ন উঁচু জমিতে অবস্থান নেয়। এই অবস্থান থেকে এমন একটি সুবিধাজনক পয়েন্ট পর্যন্ত ক্রলিং করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেখানে তিনি শত্রু অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন। একটি স্টেন-গান এবং দুটি গ্রেনেড নিয়ে তিনি প্রথমে তাঁর অবস্থানে যান এবং কুতুবুদ্দিনের সংকেতে শত্রু অবস্থানের দিকে গ্রেনেডটি নিক্ষেপ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'পক্ষের তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়। করুণা বেগম তাঁর স্টেনগান নিয়ে যোগ দেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ডান পা-এর উরুতে গুলি লাগে। তিনি ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসেন এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন। তখন সেখানে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়ার মত কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। সহযোদ্ধারা গামছা দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থান পেঁচিয়ে রাখেন এবং নদীর পানি দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থান ধোয়ার চেষ্টা করেন।

[১৭৩] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৩।
[১৭৪] ঐ।

তারপর, রক্তমাখা কাপড় নদীতে ফেলে দেন, যেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা কিছু বুঝতে না পারে। উল্লেখ্য, সেই মুহূর্তে তাঁর সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, করুণা বেগম একজন মহিলা। কুতুবুদ্দিন অপারেশন প্রত্যাহার করেন এবং তাঁরা করুণা বেগমকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যান।[১৭৫]

পরবর্তীতে, মুক্তিবাহিনীর শিবিরে ফিরে আসার পর করুণা বেগমের অবস্থার দ্রুত অবনতি হয় এবং তিনি মারাত্মক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, চিকিৎসা সহায়তা এবং অস্ত্রোপচার ছাড়া, তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন না। কুতুবউদ্দিন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে তাঁকে নৌকায় করে বরিশাল সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেন। ডাক্তার এবং নার্সরা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেন। সতর্কতা অবলম্বন করেন যাতে তাঁর পরিচয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের কাছে প্রকাশ না হয়।[১৭৬]

৫.২.৩ একাত্তর পরবর্তী জীবন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। বিজয়ের পর, মুক্তিযোদ্ধারা উন্নত চিকিৎসার জন্য করুণা বেগমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর করুনা বেগম সম্পর্কে জানতে পারেন। পরবর্তীতে, বঙ্গবন্ধু নির্দেশে কর্নেল এম এ জি ওসমানী তাকে ঢাকা সেনানিবাসের সম্মিলিত মেডিকেল হাসপাতালে (সিএমএইচ) পাঠান। সিএমএইচে থাকাকালীন সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কর্নেল এম এ জি ওসমানীর কাছ থেকে বিশেষ সাক্ষাৎ পান। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করেন। এটা তাঁর জীবনের একটি বড় প্রাপ্তি ছিল।[১৭৭]

[১৭৫] **সাক্ষাৎকার:** কর্ণেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত।

[১৭৬] ঐ।

[১৭৭] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪।

পরবর্তীকালে, বঙ্গবন্ধু করুণা বেগমকে একটি পত্রও পাঠিয়েছিলেন। পত্রটি নিম্নরূপ:[১৭৮]

শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী
গণভবন, ঢাকা

প্রিয় বেগম করুণা,

বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামে তুমি যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহসিকতা ও নির্ভীকতা দেখিয়েছ তা' দুনিয়ার ইতিহাসে দেশ-প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই দেশ আজ তোমাদের জন্য গর্বিত। দেশকে স্বাধীন করার যে মহান দায়িত্ব তোমরা পালন করেছ সেজন্য বাঙালীরা তোমাদের কাছে চিরঋণী।

তাই বাংলাদেশ সরকার, জনগণ ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছা রইলো।

শেখ মুজিব

(শেখ মুজিবুর রহমান)

---

[১৭৮] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক কর্তৃক সংগৃহিত।
আরো দেখুন: The Daily Star, 26 March, 2012.

১৯৭১ পরবর্তী সময়ে দেশ স্বাধীন করার যুদ্ধ শেষ হলেও করুনা বেগমের জীবন যুদ্ধ শেষ হয়নি। হাসপাতালে দীর্ঘ চিকিৎসা করুণা বেগমের জীবন রক্ষা করতে পারলেও, তাঁর পা রক্ষা করতে পারেন নি। একটি স্থায়ী অক্ষমতা সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।[১৭৯]

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে করুণা বেগম দ্বিতীয় বিয়ে করেন বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার রাকুদিয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা মানিককে। যুদ্ধের সময় তাঁরা একই ক্যাম্পে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। শারীরিক অক্ষমতার কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে গ্রহণ না করায় জীবিকার সন্ধানে গোলাম মোস্তফা ও করুণা বেগম ঢাকায় চলে আসেন। তাঁরা বছরের পর বছর সংগ্রাম করেন। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করুণা বেগম এবং তাঁর পরিবারের জন্য ১৪৪, লালবাগ রোডে কিছু জমি বরাদ্দ দেন। তবে, প্রাপ্ত জায়গায় আবাস-স্থল নির্মাণ করতে করুনা বেগমকে বহুমাত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অতঃপর, ২০০৪ সালে সরকার প্রদত্ত ঐ জমিতে তিনি বাড়ি নির্মাণ করেন।[১৮০]

ইতোমধ্যে, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২০০৮ সালের আগস্টে, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার চিকিৎসার পত্রসহ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়পত্র দেখিয়ে করুণা বেগমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। কিন্তু, হাসপাতালে বেড খালি না থাকাই তাঁকে পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে তাঁর অনেক ধারকর্য হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, করুনা বেগমের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। প্রত্যেকেই পড়াশোনা করে। একদিকে মায়ের চিকিৎসা, অন্যদিকে পড়াশোনার খরচ চালানো তাদের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে যায়। অবহেলা, দারিদ্র আর ক্যান্সারের সাথে সংগ্রাম করতে করতে মৃত্যুঅবধি একজন যোদ্ধা তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন।[১৮১]

[১৭৯] ***সাক্ষাৎকার:***কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত।

[১৮০] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫।

[১৮১] লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

" পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাকে মারতে পারল না,
কিন্তু মরণব্যাধি ক্যান্সার আমাকে মেরে ফেলল।"[১৮২]

৫.২.৫ শেষজীবন

করুনা বেগম দারিদ্র্য এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ২২শে জানুয়ারী ২০০৯-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে আজিমপুরে দাফন করা হয়। তিনি তাঁর স্বামী এবং পাঁচ সন্তানকে রেখে গেছেন, যারা আজ অবধি দরিদ্রময় জীবন অতিবাহিত করছে।[১৮৩]

অথচ, একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্নে অসংখ্যবার সম্মুখ যুদ্ধে অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবিলা করা সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা করুণা বেগমকেও ভুলে গেছে ইতিহাস। অন্যান্য নারী মুক্তিযোদ্ধার মতোই বিজয়ের পঞ্চাশ বছরেও উপেক্ষিত তিনি। নেই বীরত্বের কোনো স্বীকৃতি। শুধু মুখে মুখে মানুষের গল্পগাঁথায় উচ্চারিত হয় তাঁর গ্রেনেড নিক্ষেপের কাহিনী। ছদ্মবেশে যুদ্ধ জয়ের দুঃসাহসিকতা।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের দোয়ারিকা-শিকারপুর ফেরিঘাটের পার্শ্ববর্তী রাকুদিয়া গ্রামের করুণা বেগমের বীরত্বগাথা প্রথম গণমাধ্যমে তুলে আনেন কথাসাহিত্যিক ও গবেষক সেলিনা হোসেন। তাঁর ভাষায়, বীরপ্রতীক খেতাব পাওয়ার মতো যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাননি করুণা বেগম।

একাত্তরে করুণা বেগমের অবদান প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, "মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে করুণা বেগমদের সাহসিকতা উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। আমরা এ নিয়ে অনেক আন্দোলন করেছি। বর্তমানে সরকার নারী মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দেয়া শুরু করেছে। তবে করুণা বেগমের মতো একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে এতদিনেও স্বীকৃতি না দেওয়ার দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারে না মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।"

[১৮২] *সাক্ষাৎকার:* কর্ণেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত।
[১৮৩] *উইমেন নিউজ ২৪.কম*, প্রাগুক্ত।

৫.২.৬ পরিশেষ

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল নারী-পুরুষের সম্মিলিত জনযুদ্ধ। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধেও নারীরা পুরুষ তান্ত্রিকতার শিকার। নারীদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল শারীরিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার হুমকি স্বরূপ। এ সকল ঝুঁকিকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষ ছদ্মবেশ ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন শিরিন বানু মিতিল এবং করুনা বেগম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শিরিন বানু মিতিল সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিলেন এবং বাংলাদেশ অর্জিত হওয়ার পশ্চাতে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি একজন মানুষ হিসেবে যুদ্ধে লড়েছিলেন; তিনি ছিলেন ঝাঁজির রানী লক্ষ্মীবাইয়ের মতো, যিনি ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর দেশকে অত্যাচারী পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত করার। তাঁর আদর্শ নীতিবাক্য ছিল যে,

"আমাদের মাথা কাটা যাবে
কিন্তু নৃশংস শাসনের কাছে মাথা নত করা যাবে না।"

এই আদর্শে উজ্জীবিত শিরিন বানু মিতিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর দেশের প্রতি গভীর দেশপ্রেম ছিল যা তাঁকে একজন ছেলের ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য করেছিল। আর এইভাবেই, তিনি তাঁর পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সামনের সারিতে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন।

অন্যদিকে, করুণা বেগম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে স্বামী হত্যার মাধ্যমে বিধবা হওয়ার পর, মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে প্রথম সারিতে পুরুষের পাশাপাশি যে সাহসিকতা ও নির্ভীকতা দেখিয়েছেন তা ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। লিঙ্গ বা সামাজিক পরিস্থিতি দ্বারা যে বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

অথচ, বর্তমান অবধি সশস্ত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে সকল নারী অস্ত্র চালিয়েছে, গ্রেনেড ছোড়াসহ সম্মুখ যুদ্ধে পুরুষের সাথে যুদ্ধ করেছে তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। পাবনার শিরিন বানু মিতিল এবং মুলাদীর করুণা বেগমকে স্বীকৃতি না দেয়া আমাদের মানসিক দৈন্যতার বহিঃপ্রকাশ। স্বীকৃতি না পেয়েই চলে গেলেন তাঁরা। বর্তমান সরকারের সময় স্বীকৃতি দেয়া শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে, সরকারের প্রতি শিরিন বানু মিতিল এবং করুণা বেগমের বীরত্বগাঁথার যথাযথ স্বীকৃতি প্রত্যাশা করছি।

শেষত বলা যায়, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা নিজস্ব উপায়ে সেই বাধাগুলি অতিক্রম করেছিল। মুক্তিযোদ্ধা এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কোন গ্রামে স্থান পায়নি। বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প সুন্দরবনের বগীতে যান। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের দুইবোন

এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম

অধ্যায়-৬
মুক্তিযুদ্ধের দুইবোন
এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম

৬.১ জন্ম ও বেড়ে ওঠা

মুক্তিযোদ্ধা এস এম মনোয়ারা বেগম ১৯৫৩ সালে এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম ১৯৫৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালি জেলার টাউন কালিকাপুর ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা সড়কে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম শরিফ হোসেন সরদার। মায়ের নাম সোনাবানু। পাঁচ বোন এবং এক ভাইয়ের মধ্যে এস এম মনোয়ারা বেগম চতুর্থ এবং এস এম আনোয়ারা বেগম সবার ছোট। এস এম আনোয়ারা বেগম-এর বয়স যখন ২ বছর তখন তাঁরা পিতৃহারা হন। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে নারীরা অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মায়ের একান্ত প্রচেষ্টায় সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁরা পড়াশোনা চালিয়ে যান। স্কুলজীবন থেকে তাঁরা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা স্কুলে মীনাবাজারের উদ্যোগ-এর সাথে জড়িত ছিলেন। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁরা খেলাধুলা করতেন। স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে, তাঁরা কুরআন তেলাওয়াত, কবিতা আবৃত্তি, ভাটিয়ালি গান ও নাটকে অংশগ্রহণ করতেন এবং প্রত্যেকটিতে বিজয়ী হতেন।

প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করেন উত্তর কালিকাপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুল থেকে। তারপর, তাঁরা একই সাথে ১৯৭০ সালে পটুয়াখালি সরকারি গার্লস স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন। এ এস এম মনোয়ারা বেগম বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অন্যদিকে, এস এম আনোয়ারা বেগম মানবিক বিভাগ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।[১৮৪]

৬.২ রাজনৈতিক জীবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষণাকৃত ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকারের বিপক্ষে সারা পূর্ব বাংলায় তখন আন্দোলন শুরু হয়। জনগণ ৬ দফার দাবিতে মিছিল, সমাবেশ করতে থাকে। মূলত এই মিছিলকে কেন্দ্র করে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম রাজনৈতিক

[১৮৪] *সাক্ষাৎকার:* প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, স্থান: ১৬৮/এ, গ্রিনরোড, উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা, তারিখ: ১৬ এপ্রিল, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন-লাবনী ইসলাম চুমকী।

কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা নিয়মিত বড় ভাইয়ের সাথে মিছিলে যেতেন। ভাই সরদার রশিদ ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। তাই, বয়সে ছোট হলেও ভাইয়ের সাথে সাথে তাঁরা মিছিলে যেতেন। স্লোগান দিতেন। এভাবে মিছিলে অংশগ্রহণ করতে করতে তাঁদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক চেতনার জন্ম হয়।

স্কুল জীবনে তাঁরা ভাইয়ের সংগ্রহে রাখা *আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, মাসুদ রানা* সিরিজের বইগুলো পড়তেন। এই সকল বই তাঁদের মধ্যে একটা সাহস তথা দুঃসাহসিক কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগায়।

তারপর, তাঁরা নিয়মিত খবরের কাগজ 'দৈনিক ইত্তেফাক' পড়তেন। বিশেষত, ঐ সময়ে সংগঠিত ভিয়েতনাম যুদ্ধের ঘটনাবলী, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ সম্পর্কে লেখাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়তেন। প্যালেস্টাইন যুদ্ধ সম্পর্কে পড়তে গিয়ে একটা ছবি দেখেন যে, একটা দশ বছরের শিশু বন্ধুক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। শিশুটির তাকানোর মধ্যে কী অসীম সাহস আর কী অসীম দৃঢ়তা যা তাঁদের মুগ্ধ করে। দুইবোন মিলে সিদ্ধান্ত নেন ঐ শিশুটি যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে তাহলে, তাঁরা কেন পারবে না। তাঁদেরও উচিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। পরবর্তীতে ঐ ঘটনা তাদেরকে মিছিলে যেতে অনুপ্রাণিত করে।

এরপর, তাঁরা ৮ম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে ভাইয়ের সংগ্রহে রাখা কার্ল মার্ক্স-এর *Das Capital* পড়েন। প্রথমত কিছু বুঝতেন না। তারপরও পড়তেন। ভাইকে বিরক্ত করতেন বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। যাইহোক, একটা বিষয় তাঁরা বুঝলেন যে, একদল লোক আরেক দলকে শোষণ করছে। যেমনটা পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের উপর শোষণ চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নামের যে সংগঠন ঐসময় গড়ে উঠেছিল, সেই সংগঠনের কার্যকলাপের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকার বিরোধী আন্দোলন হত। তখন তাঁরা রাজনীতি বলতে বিদেশি শক্তির হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করা বুঝতো। এরই ধারাবাহিকতায়, তাঁরা ভাইয়ের সাথে সাথে ১৯৬৮ সালের আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হয়। ফলে, ১৯৬৮-৬৯ সালে মামলার প্রতিবাদে সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। শহর, বন্দর, নগর সর্বদা আন্দোলন, মিছিল, সমাবেশ চলতে থাকে। ১৯৬৯ -এর গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রত্যেকদিন সকাল ১০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১টা থেকে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত মিছিল হত। ঐ সময় এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম ছেলেদের সাথে সম্মিলিতভাবে জেলা শহরের মিছিলে যেতেন। স্কুলে গিয়ে বই রেখেই মিছিলে চলে যেতেন। মিছিল শেষে পিডিএস মাঠ ও আলাউদ্দিন শিশুপার্কে মিটিং হত। সেখানে তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সারা বাংলাদেশে নির্বাচন হয়। কিন্তু ঐ সময়ে পটুয়াখালি জেলায় বন্যার কারণে নির্বাচন স্থগিত ছিল। পরবর্তীতে, ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পটুয়াখালি জেলায় নির্বাচন হয়। নির্বাচনে তাঁরা ছিলেন আওয়ামী লীগের সক্রিয়কর্মী। ঐসময় তাঁরা নিয়মিত আওয়ামী লীগের পক্ষে ক্যাম্পেইন করতেন।

উল্লেখ্য, বন্যা দুর্গত এলাকা পাকিস্তান সরকার দেখতে যাননি, এমনকি কোন সাহায্য-সহযোগিতাও পাঠায়নি। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১৩ জানুয়ারি পটুয়াখালি জেলার বন্যা দুর্গত এলাকা দেখতে যান। তখন পটুয়াখালি জেলায় আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন এ্যাডভোকেট কাশেম। তিনি প্রস্তাব করেন, "এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম বঙ্গবন্ধুকে ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানাবে।" প্রস্তাবটি দুইবোনকে উচ্ছ্বসিত করে। তাঁরা রাত জেগে নীল, সাদা আর সবুজ তিন ধরনের চিনি কাগজ দিয়ে নিজ হাতে বঙ্গবন্ধুর জন্য মালা গাঁথেন। পরের দিন সেই মালা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানান। প্রথমবার তাঁরা বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ পায়। ঐসময় তাঁদের ভাই সরদার রশিদ জেলে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ঘটনাটি জানতে পেরে বৈঠক শেষে তাঁদের বাড়িতে যান। পরিবারের লোকদের সাথে দেখা করতে। বঙ্গবন্ধু তাঁদের বাড়িতে আসলে মাতা সোনাবানু কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

তখন, বঙ্গবন্ধু তাঁদের মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে,

"রশিদ একা আপনার ছেলে নয়,
আমিও আপনার ছেলে।
এক ভাই থাকতে আরেক ভাইয়ের কিছুই হবে না।"

পরবর্তীতে, বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় ভাই সরদার রশিদ জেল থেকে মুক্তি পান। ঐ সকল ঘটনা তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আরো উদ্বুদ্ধ করে। ফলে, তাঁরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শে উজ্জীবিত হন। তাঁরা ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন।[১৮৫]

[১৮৫] *সাক্ষাৎকার:* প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, প্রাগুক্ত।

৬.৩ একাত্তরের রণাঙ্গনে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম

৬.৩.১ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭-ই মার্চের ভাষণ রেডিও তে শোনেন। এই ৭-ই মার্চের ভাষণের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী, ৭-ই মার্চের পরপরই সারা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। এই ধারাবাহিকতায়, স্থানীয়ভাবে পটুয়াখালি সরকারি জুবলী স্কুলের মাঠে বেসামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রতিদিন সকালে মিছিল হত আর বিকাল ৩ ঘটিকায় ট্রেনিং হত। অবসর প্রাপ্ত দুইজন সেনাবাহিনীর সদস্য জনাব ইসমাইল হোসেন এবং জনাব তোহা ছিলেন তাঁদের প্রশিক্ষক। মূলত, এই প্রশিক্ষণের তিনজন নারী সদস্য জনাব মমতাজ, এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম ব্যতীত সবাই ছিলেন পুরুষ সদস্য। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে তাঁরা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহকৃত অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেন।

এই পর্বে, তাঁদের কীভাবে অস্ত্র ধরতে হয়?
কীভাবে বন্ধুক কাঁধে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুড়তে হয়?
কীভাবে বন্দুক খুলতে হয়? – প্রভৃতি বিষয়গুলো আয়ত্ত্ব করেন।

ট্রেনিং-এর পাশাপাশি ঐ সময় তাঁরা জনগণের বাড়িতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারনা চালিয়েছেন। জনগণকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে বাংকার খুঁড়ে রাখার পরামর্শ দেন। যুদ্ধ শুরু হলে যেন জনগণ সেই বাংকারের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এছাড়া, তাঁরা মহিলাদের রান্না করার পর চুলার ছাঁই এবং মরিচের গুঁড়া মজুদ রাখার পরামর্শ দেন। অতর্কিত আক্রমন করলে যেন সেগুলো বিপক্ষের উপর ছুঁড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়।

পটুয়াখালি জেলা নদী-নালায় ভরপুর। এক্ষেত্রে, তাঁরা জনগণকে খালের একপাশ থেকে অন্যপাশে যাওয়ার যে বাঁশের সাঁকো থাকে সেটি বিচ্ছিন্ন করার পরামর্শ দেন। তাঁদের উদ্যোগে স্থানীয়দের সহায়তায় সকল সংযোগ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। উদ্দেশ্য- পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেন পারাপার না হতে পারে।[১৮৬]

[১৮৬] *সাক্ষাৎকার:* প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, প্রাগুক্ত।

৬.৩.২ মুক্তিযুদ্ধের অভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবে জীবন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার খবর এবং বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রেডিও-তে প্রকাশিত হবার পরপরই সারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি পাল্টে যায়। জনগণ বাঁচার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালাতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী পটুয়াখালি আক্রমণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারে করে জেলা শহরে প্রবেশ করতে থাকে। মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতি, দলাদলি আর অবিশ্বাস তৈরি হতে থাকে। একপক্ষ যোগ দেয় পাকিস্তানি শাসকের দলে, অন্যপক্ষ থেকে যায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর দলে। তখন অনেক কিছু চিন্তা করে চলতে হতো। বাসার কাছেই ছিল CNB অফিস। ঐ অফিসের Officer ছিলেন প্রফুল্ল কুমার হালদার।

তিনি পরামর্শ দেন,

> "তোমরা এখন বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শহরে যাবে না। শহরে গেলে সবাই তোমরা মারা যাবে। তোমরা নিরাপদে চলে যাও। আগে সংগঠিত হও। তারপর আক্রমণ কর।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে, অভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম মায়ের সাথে গন্তব্যহীন যাত্রা শুরু করেন। প্রথমে, ইটবাড়িয়া নামক একটি এলাকায় আশ্রয় নেন। ঘটনাটি জানার পর ঐ এলাকা আক্রমণ করা হয়। ৩৬ টি বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। মা-বোনদের সম্ভ্রম হানি করা হয়। ঐ এলাকায় অনেক স্বীকৃত বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা আছে।

এরপর, তাঁরা মায়ের এক আত্মীয়ের বাড়িতে যান। কিন্তু সেখানে গ্রামের লোকেরা তাঁদেরকে থাকতে দেয়নি। গ্রামবাসীর ধারণা ছিল, তাঁদেরকে থাকতে দিলে তাদের গ্রামও জ্বালিয়ে দিবে। তাঁরা আবার গন্তব্যহীন যাত্রা শুরু করেন।

তারপর, ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি আমতলি যান। ৭-৮ দিন থাকার পর ঐ এলাকার লোকেরা জানতে পারে শহর থেকে মিছিল করা ২ জন মেয়ে আসছে। যাদেরকে থাকতে দিলে রক্ষা নেই। তাই, গ্রামের লোকেরা তাঁদেরকে তাড়িয়ে দেয়। অনেকেই কটুক্তি করে বলতে থাকে, "খুব লাফাইছো না? মিছিল করছো, সমাবেশ করছো, মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছো? আর এখন লাফাচ্ছো না কেন? ভয়ে পালাচ্ছো কেন?[১৮৭]

[১৮৭] *সাক্ষাৎকার:* প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, প্রাগুক্ত।

এরপর, বোনের শ্বশুরবাড়ি ধানখালি যাই। ৯-১০দিন থাকার পর, বোন কয়েকজন লোকের সাথে দুইবোন কে পাঠিয়ে দেয়। তাদের সাথে তাঁরা ধানখালি ইউনিয়নের পঞ্চবটি গ্রামে জনৈক আজিজ মাস্টারের বাড়িতে যাই। সেখানে তাঁদের ভাইয়ের সাথে দেখা হয়।

ইতোমধ্যে, তাঁদের বোনের বাসা থেকে তাঁদের মাকে পাকিস্তানি বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে। আর মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে তাঁদেরকে ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার আর ৩০ ভরি স্বর্ণ দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁরা কোন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁরা আগুনমুখো নদীর পাড়ে বিরাট জঙ্গলের এক টিলার উপর আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা তিন দিন তিন রাত না খেয়ে এক অনিশ্চয়তার জীবন অতিবাহিত করেন।

অবশেষে, ৯-নং সেক্টরের সাব-সেক্টর সুন্দরবনের ইনচার্জ লে. জিয়াউদ্দিন ঘটনাটি জানতে পেরে তাঁদেরকে আনার জন্য মুক্তিযোদ্ধা পাঠান। পরিশেষে, শরণার্থী জীবনের অবসান ঘটে। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নৌকায় করে বালেশ্বর নদী পাড়ি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প সুন্দরবনের বগীতে যান। শুরু হয় তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নতুন সংগ্রামী জীবন।[১৮৮]

৬.৩.৩ গেরিলা প্রশিক্ষণ

প্রথমে তাঁরা গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন। লে. জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের কাছ থেকে তাঁরা গেরিলা প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে কয়েকটা টেকনিক আয়ত্ত্ব করেন।

যেমন-

- অতর্কিত আক্রমণ: যদি সংখ্যায় কম থাকে তাহলে কীভাবে পেছন দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করতে হয়?
- হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ: নিজেদেরকে সেভ রেখে শত্রুর বিপক্ষে কীভাবে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে হয়? কীভাবে একটা গাছের পেছনে লুকিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে হয়?
- শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ: অন্ধকারে কীভাবে শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করতে হয়?
- ক্রলিং: শত্রুর অবস্থানের কাছে ক্রলিং করে কীভাবে এগিয়ে গিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়?

[১৮৮] *সাক্ষাৎকার:* প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, প্রাগুক্ত।

৬.৩.৪ অস্ত্র প্রশিক্ষণ

থ্রি নট থ্রি রাইফেল, স্টেনগান, এস.এম.সি, এস.এম.জি অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেন। এক্ষেত্রে তাঁরা আয়ত্ত্ব করেন-

- কীভাবে অস্ত্র ধরতে হয়?
- কীভাবে বন্ধুক কাঁধে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুড়তে হয়?
- কীভাবে বন্দুক খুলতে হয়?

উল্লেখ্য, একদিন প্রশিক্ষণ নিতেন। আরেকদিন পরীক্ষা দিতেন।

৬.৩.৫ সেন্ট্রি (ক্যাম্প পাহাড়া)

প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাঁরা রাতে ক্যাম্প পাহাড়া দিতেন। সুন্দরবন জঙ্গলের কাছে ক্যাম্প হওয়ায় রাতের বেলায় হিংস্র প্রাণীর আক্রমনের ভয় ছিল।এক্ষেত্রে, মুক্তিযোদ্ধারা পর্যায়ক্রমভাবে ক্যাম্প পাহাড়া দিত। বাঘের ডাক শুনলে গুলি ছুঁড়তো, বাঘ দূরে চলে যেত।

৬.৩.৬ রেকি

এটি ছিল অপারেশনের আগে শত্রুর অবস্থান চিহ্নিতকরণ। এই প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা সুন্দরবন, ডোবাতলা, শরণখোলা, নামাযপুর, কাকচিড়ায় রেকির কাজ করেন।

৬.৩.৭ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সশস্ত্র অপারেশন

ক. বরিশালের তুষখালি অপারেশন

এটি ছিল গোডাউন থেকে খাদ্য লুট। মূলত, মুক্তিযুদ্ধকালীন ইদুল ফিতরের দিন ক্যাম্পের সকল মুক্তিযোদ্ধারা না খেয়ে ছিলেন। তাই তাঁরা খাদ্যের জন্য বরিশালের তুষখালি যান। গোডাউনের পাহাড়াকৃত সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় জানতে পেরে কোন বাধা দেয়নি। এক্ষেত্রে, বিনা প্রতিবন্ধকতায় অপারেশন সফল হয়। মুক্তিযোদ্ধারা খাদ্য নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসে।

খ. মোড়লগঞ্জের রায়েন্দা অপারেশন

১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে মোড়লগঞ্জের রায়েন্দা অপারেশন সংগঠিত হয়। এই অপারেশনে নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের সাথে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধা এস এম মনোয়ারা বেগম

এবং এস এম আনোয়ারা বেগম স্টেনগান হাতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সাথে ছিল সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র বরিশালের টিপু সুলতান। দুর্ভাগ্যবশত, সে এই যুদ্ধে শহিদ হন। এছাড়া, পুলিশ হাবিলদার আলাউদ্দিন এবং জনাব আসাদ নামের দুইজন শহিদ হন। উল্লেখ্য, নিয়মানুযায়ী অপারেশনের আগে শত্রুর অবস্থানের উপর যে রেকি করা হয়েছিল, সেই রেকির পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অবস্থানের পরিবর্তন করে। ফলশ্রুতিতে, রেকির নির্দেশনা অনুযায়ী চারদিক থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। শুরুতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ক্যাম্প ছেড়ে পিছু হটতে থাকে কিন্তু একপর্যায়ে, মুক্তিবাহিনীর তিনজন সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে নিয়ে পিছু হটতে থাকে। পথিমধ্যে, তিনজনই মারা যায়। পরবর্তীতে, তাঁদেরকে নিয়ে মোড়েলগঞ্জের রায়েন্দায় কবর দেওয়া হয়।

গ. ফাতরার চর অপারেশন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসম্পর্ণের পর মুক্তিযোদ্ধারা সুন্দরবন ক্যাম্প থেকে রওনা হয়। পথিমধ্যে ফাতরার চর নামক স্থানে এসে জানতে পারেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঐ ফাতরার চরে অনেক বীরাঙ্গনা মা-বোনদের একটি ঘরে আবদ্ধ করে রেখেছে। খবরটি জানতে পেরে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ফাতরার চর অপারেশনে যায়। সেখানে ৩৫ জন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল। তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। তারা আত্মসমর্পণ করে। পরবর্তীতে, তাদেরকে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আর বীরাঙ্গনাদের বস্ত্রহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

ঘ. অস্ত্র জমাদান

১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর পটুয়াখালি গার্লস হাইস্কুলের মাঠে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম রিপোর্ট করে অস্ত্র জমা দেন।

ঙ. মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি

জিয়াউর রহমানের সময় ১৯৭৮ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর 'লাল মুক্তিবার্তিকা' নামে যে প্রথম তালিকা করা হয়, সেখানেই এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পান।[১৮৯]

[১৮৯] *সাক্ষাৎকার:* প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, প্রাগুক্ত।

৬.৪ একাত্তর পরবর্তী জীবন

ক. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসন

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে তাঁরা প্যারামিলিশিয়া বাহিনীতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসনের কাজে অংশগ্রহণ করেন।

খ. শিক্ষাজীবন

এরপর, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আবার পড়াশুনা শুরু করেন। তাঁরা ১৯৭২ সালে পটুয়াখালি সরকারি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। এরপর, ১৯৭৩ সালে এস এম মনোয়ারা বেগম পটুয়াখালি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু, অসুস্থতার কারণে তিনি মেডিকেল কলেজের পড়াশোনা সমাপ্ত করতে পারেননি। অন্যদিকে, এস এম আনোয়ারা বেগম ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স এবং ১৯৭৯ সালে মাস্টার্স পাস করেন।

পরবর্তীকালে, তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।এছাড়া, তাঁর বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি; আন্তর্জাতিক রাজনীতি; সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন; রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং সংগঠন; বাংলাদেশে জনপ্রশাসন; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে একাডেমিক অভিজ্ঞতা আছে।

গ. কর্মজীবন

➢ সরকারি চাকরিতে যোগদান (বিসিএস, সাধারণ শিক্ষা):

এস এম আনোয়ারা বেগম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার হিসেবে তিনি ১৯৮৩ সালের ৯ জুন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক পদে যোগদান করেন ঝালকাঠি সরকার কলেজে। পরবর্তীতে, চাকরি করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ১৮ অক্টোবর ২০০৯ থেকে ২৭ এপ্রিল ২০১১ এবং ২৮ এপ্রিল ২০১১ থেকে ১৯ মে ২০১৩ পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন: ২০ মে ২০১৩ থেকে ১৯ মে ২০১৮ পর্যন্ত এস এম আনোয়ারা বেগম বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৯০]

ঘ. গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

- *আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমকালীন বিশ্ব*, হাক্কানি পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০০১।
- *মুসলিম নারী শিক্ষার পথিকৃৎ রোকেয়া*, জোসনা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।
- *লোক প্রশাসন প্রেক্ষিত*, বাংলাদেশ-এশিয়া পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০০৫।
- *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ২য় পত্র*, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০-২০১১।
- *নারীর কৃষিযাত্রা*- সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১।
- *তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন*-২০১৩।
- *জাতির পিতা- শেখ মুজিবুর রহমান*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন ২০১৮।
- *বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৮।
- *মাদার অব হিউমানিটি-শেখ হাসিনা*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০২০।
- *বাংলাদেশ অর্থনিতির চার দশক*, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯।
- *সমষ্টিক অর্থনীতি*, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০০৯।
- *মিডল ইস্ট পলিটিক্স: ইস্যুস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস*, এশিয়ান স্টাডিজ, জুন, ২০১০।
- *বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১০।
- *জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে স্ব-বাস্তবকরণ এবং পরিবেশগত আচরণের পরিবর্তন*, মানব সম্পদ তথ্য ও উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সংকলন কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১১।
- *বাংলাদেশের এশিয়ান স্টাডিজে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিফলন*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০১৪।[১৯১]

[১৯০] *সাক্ষাৎকার*: প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, প্রাগুক্ত।
[১৯১] ঐ।

৬. পুরস্কার

- ❖ নারী মুক্তিযোদ্ধা, ডেসটিনি গ্রুপ, সেক্টর হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্মাননা-কমান্ডারস ফোরাম-২০১০।
- ❖ নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা', গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র-২০১১।
- ❖ নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা', জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০১২।
- ❖ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ হিসেবে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা', পটুয়াখালী-২০১৬।
- ❖ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, মুক্তিযোদ্ধা একাডেমি-২০১৪।
- ❖ পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন -২০১৫ থেকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার (গোল্ড মেডেলিস্ট)।
- ❖ ৭১ ফাউন্ডেশন-২০১৮ হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা।
- ❖ শিক্ষায় অবদানের জন্য- একজন সফল বিপ্লবী নারী - ২০২০ পুরস্কার লাভ করেন।[১৯২]

৬.৫ আত্মোপলব্ধি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর এস এম আনোয়ারা বেগম বলেন,

"দেশকে যদি কেউ ভালবাসে, তাহলে সেই দেশের জন্য অবদান, যে যেখানের হোক সেখান থেকে রাখতে পারে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে। তদ্রূপ, মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরা কেউ রান্না করে দিয়েছে, কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে আশ্রয় দিয়েছে, কেউ আবার স্বামী-সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে। আবার আমরা সৈনিক হিসেবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছি। আমরা বিজয়ী সৈনিক। তাই আমাদের স্বাধীনতা শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের অর্জন নয়, এটা সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অর্জন। যাঁরা তৎকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন করেছে।"

তিনি আরও বলেন যে, "বর্তমান সময়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি স্বাধীন দেশে নানা রকম ষড়যন্ত্র করছে। মূলত বঙ্গবন্ধু মৃত্যু পরবর্তী ২১ বছর বিভিন্ন বিরোধী শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন থাকায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে যা

[১৯২] *সাক্ষাৎকার*: প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, প্রাগুক্ত।

আজ অবধি চলমান। এক্ষেত্রে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন হতে হবে। অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। এটা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এই যুগের মুক্তিযোদ্ধা, এই যুগের সৈনিক তোমরা। কেউ গবেষণা করে, কেউ বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচীতে যোগদান করে, কেউ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উপস্থাপন করছো। তাই, নতুন প্রজন্মের কাছে আমার প্রত্যাশা তোমরা দেশটাকে ভালবাসবে। দেশের মুক্তিযুদ্ধকে লালন করবে। কারণ-জাতি হিসেবে আমরা যে বাংলাদেশি তার শিকড় হল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। তাই মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিয়ে জাতির এগিয়ে চলা সম্ভব নয় বরং মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে জাতিকে এগিয়ে যেতে হবে। তা না হলে আমরা দিক বিভ্রান্ত হয়ে যাব।"

বর্তমান মুক্তিযোদ্ধারা জাতির কাছে প্রত্যাশা করেন যে,

> " মুক্তিযোদ্ধারা যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা এখনো অনেক জায়গায় নানাভাবে অসম্মানিত হচ্ছেন। তাদের প্রতি জাতির সহানুভূতি দেখানো প্রয়োজন। অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। আবার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি স্বীকৃত মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছেন। এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সংখ্যা যাচাই-বাছাই করা উচিত। এজন্য কর্তৃপক্ষের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।" [১৯৩]

৬.৬ শেষজীবন

২০০৯ সালের ১২ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধা এস এম মনোয়ারা বেগম মৃত্যুবরণ করেন। বক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অবিবাহিত। পরে তাকে পটুয়াখালি মুক্তিযোদ্ধা সড়কে পৈতৃক পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

অন্যদিকে, মুক্তিযোদ্ধা এস এম আনোয়ারা বেগম সম্প্রতি পেশাগত জীবনে বিপর্যস্ত। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চাকরির সময়সীমা বৃদ্ধি ইস্যুতে তিনি মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। তিনি চাকরির পেনশন অর্থও পাননি। অথচ, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বর্ধিত দুই বছর চাকরির সময়সীমা ও চাকরির পেনশন তাঁর প্রাপ্য অধিকার। এছাড়া,স্বামীর মৃত্যুতে পারিবারিকভাবে তিনি নানাবিধ সমস্যায় জীবন অতিবাহিত করছেন।

[১৯৩] *সাক্ষাৎকার:* প্রফেসর ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, প্রাগুক্ত।

৬.৭ পরিশেষ

মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে যেকোন ভূমিকা পালন করলেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী স্থানীয় রাজাকারদের আক্রমণের স্বীকার হতে হয়েছে। তদ্রূপ, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম অংশগ্রহণ করেন। অস্ত্র প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলনের মিছিল, মিটিং, সভা, সমাবেশে অংশ নেন। ফলে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর তাঁরা প্রথমে আভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবে গ্রামে গ্রামে আশ্রয়ের জন্য গন্তব্যহীন জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু কোন গ্রামের কোন বাড়িতেই তাঁরা ঠাঁই পায়নি। বরং, যে গ্রামে গিয়েছেন সে গ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী স্থানীয় রাজাকাররা অভিযান চালিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, সেই গ্রামে লুট করছে, ঘর বাড়িতে আগুন দিয়েছে। ফলে, তাঁরা সুন্দরবন জঙ্গলের এক টিলার উপর কিছুদিন জীবন কাটিয়েছেন। তারপর, ৯-নং সেক্টরের সাব-সেক্টর সুন্দরবনের ইনচার্জ লে. জিয়াউদ্দিন তাদের উদ্ধার করে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। একাত্তরের দিনগুলিতে তাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

শেষত বলা যায়, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন হিসেবে মিছিল, মিটিং, সভা, সমাবেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই পর্বে এস এম মনোয়ারা বেগম এবং এস এম আনোয়ারা বেগম-এর ন্যায় অসংখ্য নারী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অসহযোগ আন্দোলনের মিছিল, মিটিং, সভা, সমাবেশ এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নারীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম ও ফোরকান বেগম। পাশাপাশি, একাত্তরের রণাঙ্গনে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, শাহানা পারভীন শোভা, স্বর্ণলতা ফলিয়া এবং আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র নারীসমাজঃ কয়েকটি কেস-স্ট্যাডি

৭.১ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্ব প্রসঙ্গ

৭.১.১ মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী

৭.১.২ মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ বেগম

৭.১.৩ মুক্তিযোদ্ধা ফোরকান বেগম

৭.২ মুক্তিযোদ্ধা স্বর্ণলতা ফলিয়া

৭.৩ আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ

৭.৪ একাত্তরের রণাঙ্গনে বরিশালের পেয়ারা বাগানঃ

সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা বিথীকা বিশ্বাস, শিশির কণা

এবং

শাহানা পারভীন শোভা

৭.৫ আত্মোপলব্ধি

৭.৬ পরিশেষ

অধ্যায়-৭
স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র নারীসমাজ: কয়েকটি কেস-স্ট্যাডি

৭.১ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারী সমাজের একটি অংশ যেমন প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছেন। তেমনি আরেকটি অংশ নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। বাংলাদেশের নারী জাগরণে অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় যাঁরা পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলন, রাজনীতি, বাংলার মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে সক্রিয় থেকে অসামান্য অবদান রেখেছেন। প্রচার বিমুখ এই সকল নারী সমাজ, দেশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবিচল থেকে কাজ করেছেন নীরবে নিভৃতে।[১৯৪] তাঁরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কাজ করেছেন। ১৯৬৬ সালে 'বাঙালির মুক্তির সনদ' বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ -এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হিসেবে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেন।

এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তিন জন নারী মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ বেগম এবং মুক্তিযোদ্ধা ফোরকান বেগম সম্পর্কে বিবরণ তুলে ধরা হল।

৭.১.১ মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী

ক. জন্ম ও বেড়ে ওঠা:

জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মন্ত্রী। তিনি ১৯৩৫ সালের ৮ মে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার চন্দ্রপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সৈয়দ শাহ্ হামিদুল্লাহ এবং মাতার সৈয়দা আছিয়া খাতুন। পিতা সৈয়দ শাহ্ হামিদুল্লাহ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।[১৯৫] পাশাপাশি, তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। দাদা সৈয়দ সাজ্জাদ জাফর ব্রিটিশ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর ছিলেন। একবার তিনি বিপ্লবী বারীণ ঘোষকে গ্রেপ্তার করতে যান।

[১৯৪] *বিজনেস বাংলাদেশ.কম*, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

[১৯৫] মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃষ্ঠা: ১৬৯।

ওই সময় বারীণ ঘোষের মাতা তাঁর দাদাকে বলেন[১৯৬],

'বাবা, তুমি দেশের ছেলে হয়ে বারীণকে গ্রেপ্তার করবে?
ওরা তো দেশের মঙ্গলের জন্যই কাজ করছে।
আর তুমি ব্রিটিশদের স্বার্থে গ্রেপ্তার করে ওকে ব্রিটিশের কাছে তুলে দেবে?'

–ঐ কথাগুলো তাঁর দাদার মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে, কংগ্রেসের সদস্য হয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হন। পরবর্তীতে, তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে জেলও খেটেছেন।[১৯৭]

খ. পারিবারিকও রাজনৈতিক জীবন:

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ছোটবেলায় মাত্র ৯ বছর বয়সে মাতৃহারা হন। এরপর, তিনি দাদি ও ফুফুদের স্নেহছায়ায় বেড়ে উঠেন। দাদি সৈয়দা হামিদুন্নেসা খাতুনের প্রভাবই তাঁর ওপর বেশি। জন্ম ফরিদপুরে হলেও তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলকাতায়। পরবর্তীতে, ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামের একসময়ের ছাত্রলীগের নেতা ও ভাষা সৈনিক গোলাম আকবর চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর, তিনি ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামে চলে আসেন।[১৯৮]

১৯৫৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হন। তখন মেয়েদের রাজনীতি করার পরিবেশ ছিল না। কিন্তু স্বামীর অনুপ্রেরণায় তিনি বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথমে অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (আপওয়া) সঙ্গে যুক্ত হন।[১৯৯]

তারপর, ১৯৬১ সালে তিনি আপওয়ার চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও পরে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা আবদুল আজিজ সাহেবকে মুসলিম লীগের কর্মীরা মেরে ড্রেনে ফেলে দেয়। অনেকের ধারণা হয়, আজিজ সাহেব মারা গেছেন। ওই দিন

[১৯৬] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, সংগ্রাহক: কালের কণ্ঠ, ০৬ মার্চ, ২০১১।
[১৯৭] ঐ।
[১৯৮] মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭০।
[১৯৯] মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭১।

তাঁরা ১৫-২০ জন মহিলা সরকারি বাধা উপেক্ষা করে মিছিল করেন। চট্টগ্রামের নেতা ও সাধারণ জনগণ মিছিলকারীদের করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করে। তাঁর ভাশুর আহমেদ চৌধুরী ও পূর্ণেন্দু দস্তিদার বিকেলে লালদীঘির ময়দানে বক্তব্য দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। ওই দিনের বক্তৃতাই ছিল মঞ্চে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক বক্তব্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে চট্টগ্রামে আসেন। ওই সময় তিনি মহিলাদের সংগঠিত করে লালদীঘির ময়দানের সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় খুশি হয়ে ঢাকায় চলে আসার জন্য বলেন। তিনি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পরিবার-পরিজনসহ ঢাকায় চলে আসেন। ইতোমধ্যে, ছয় দফা ঘোষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে, সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে তিনি রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।[২০০]

১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো বেগবান হয়। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী নিয়মিতভাবে আওয়ামী লীগ অফিসে বসার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে নারীদের জন্য একটা কক্ষ বরাদ্দের আবেদন জানান। অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু নিজের বসার ভালো কক্ষটি নারীদের জন্য দিয়ে অন্য একটি কক্ষে চলে যান। ১৯৬৯ সালে ফুলার রোডে আওয়ামী লীগের একটি সভায় মহিলা আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২০১]

পরবর্তীতে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী অংশ নেন। জাতীয় পরিষদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সাতজন নারী সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

গ. একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। ছাত্র-যুব-মহিলা গণসংগঠনগুলো দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য দামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বাসা ছিল কলাবাগানের ‘মরিচা হাউস’। মহিলা আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধানে মরিচা হাউসের সামনে মিসেস টি এন রশিদের পরিচালনায় প্রায় ২০০ মহিলা প্রশিক্ষণ নেয়। ১৯৭১ সালের ৩ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ শেষে ২৩ মার্চ মরিচা হাউস থেকে মার্চপাস্ট করে তাঁরা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর

[২০০] সংগৃহিত সাক্ষাৎকার: সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

[২০১] মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭২।

হাতে মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন। প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ঐ সময় প্রায় প্রতিদিনই একাধিক সভায় বক্তব্য দেন।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ২৫ মার্চেও কয়েকটি সভায় বক্তব্য দেন। ওই দিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এসে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে জানায়, পাকিস্তানি আর্মি ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি পাকিস্তানি আর্মির গতি রোধ করার জন্য জনতার প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা গাছ কেটে গাছের গুঁড়ি দিয়ে রাস্তা আটকে দেয়। সারারাত বাড়ির সবাই জেগে থাকে, কখন কী হয় আশঙ্কায়। পরের দিন ২৬ মার্চ কারফিউ, শহর নিস্তব্ধ। কিন্তু রাতে বাসায় থাকা তিনি নিরাপদ মনে করেননি। ফলে, তাঁরা পাশের বাড়িতে সবাই আশ্রয় নেন। ২৭ মার্চ কিছু সময়ের জন্য কারফিউ শিথিল করলে গাড়ি নিয়ে বের হতেই শুনেন, তাঁর চাচাতো ভাই প্রফেসর মুক্তাদির সাহেবকে হানাদাররা গুলি করে মেরে ফেলেছে। তাঁরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, উদ্দেশ্য আরিচা হয়ে চলে যাবেন। পথে বিপদ দেখে শাহজাহানপুরে চাচা সৈয়দ হাসান মাসুদ সাহেবের বাসায় উঠেন। চাচা নির্বাক, নিজ হাতে ছেলেকে গোসল করিয়ে কবর দেন।[২০২]

৩০ মার্চ নৌকায় করে বাড্ডায় যান। সেখানে রাত কাটিয়ে ১ এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে নরসিংদী যান। কিন্তু কোনো নেতাকে না পেয়ে পরের দিন নৌকায় করে রওনা দেন ভৈরবে জিল্লুর রহমান সাহেবের উদ্দেশে। পথে নীলাক্ষীর চরে দেখেন, যুবকরা লাঠি নিয়ে প্যারেড করছে। সেখানে সবাইকে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য দেন। ভৈরবে আসার পর জানতে পারেন, জিল্লুর রহমান সাহেব পৌঁছাননি। কিছুদিন পর প্রথমে আইভি রহমান এবং আরো পরে জিল্লুর রহমান ভৈরবে আসেন। শোনেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকার গঠিত হচ্ছে। লঞ্চে করে সেখানে গিয়ে দেখেন শহর ফাঁকা, কোথাও কোনো লোক নেই। সার্কেল অফিসার সরকার গঠনের জন্য এমপিদের আহ্বান করছেন। পরে আবার ভৈরবে চলে আসেন। পরের দিন সেখান থেকে আশুগঞ্জ গিয়ে মুসলিম লীগের এক নেতার বাড়িতে উঠেন। কয়েকদিন পর তিনজন মুক্তিযোদ্ধা ওই বাসায় আশ্রয় নেয়। ওই দিনই কয়েকজন বিহারি এসে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী হুমকী দেয়। পাকিস্তানি সেনারা এসে জেরা করতেই সব বুঝতে পারে। চোখের সামনে এক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে। খাটের নিচ থেকে বাকি দুজনকে টেনে বের করে তাদেরও গুলি করে। সেদিন ছিল পহেলা বৈশাখ।

[২০২] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

তারপর, তিনি ঢাকায় ফিরে চাচার বাড়ি উঠেন। সেখান থেকে প্রথমে ফরিদপুরের মুকসুদপুর ও পরে নড়াইল যান। এ সময় নজির আহমেদ সাহেব চিঠি দিয়ে একটা ছেলেকে পাঠান। চিঠি পড়ে বুঝতে পারেন, পত্রবাহক ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইসমত কাদির গামা। ঢাকা থেকে খবর পান, বঙ্গবন্ধুর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর দেশে থাকা উচিত হবে না। ঐ প্রেক্ষাপটে, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী পরিবারসহ ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শুরু হয় সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর হেঁটে পথচলা, ইসমত কাদির গামার সঙ্গে। দিনের পর দিন হাঁটা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাঁটতে পারছে না। একবার একটাকে কোলে নেন তো আরেকবার অন্যটাকে। হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে যায়। সাত দিন হাঁটার পর সীমান্ত অতিক্রম করে বাগদাতে গিয়ে পৌঁছান। পরের দিন কলকাতা চলে যান। সেখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান সহ অনেক নেতার দেখা পান। [২০৩]

পরবর্তীকালে, নারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে মুজিবনগর সরকার একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর ওপর। জুন মাসের প্রথম দিকে মুজিবনগর সরকার এবং ভারত সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকার গোবরায় এ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করি। প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহ, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ সব আয়োজন সমাপ্ত করে শুরু হয় নারীদের নার্সিং, ফার্স্ট এইড, মোটিভেশন ও সামরিক প্রশিক্ষণ। ১৬ জন করে কয়েকটি দলকে প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন ফ্রন্টে ও হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার জন্য পাঠানো হয়। পরবর্তী দলগুলোকে আর ফ্রন্টে যেতে হয়নি। প্রশিক্ষণ শেষ হতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

ঘ. একাত্তর পরবর্তী জীবন:

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ধ্বংসপ্রাপ্ত সদ্য স্বাধীন স্বদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। নির্যাতিত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠিত হয়। তিনি ঐ বোর্ডের একজন পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থাটি পরবর্তী সময়ে মহিলা পরিদপ্তর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জিয়াউর রহমানের আমলে এক বছর জেলও খেটেছেন। বিভিন্ন মামলা মাথায় নিয়ে ঘুরেছেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয়তা অতুলনীয়।

[২০৩] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

১৯৭৫ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের মহিলা ফ্রন্টের প্রধান মনোনিত হন। তারপর, ১৯৮৩-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর, ১৯৮৭ সালে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ফরিদপুর-২ আসন থেকে নির্বাচিত হন এবং জাতীয় সংসদে উপনেতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার হন। 'রাজনীতিই তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে।'– এটাই সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর জীবনের মূলকথা।[২০৪]

৭.১.২ মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ বেগম

ক. জন্ম ও বেড়ে ওঠা

মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ বেগম তৎকালীন কুমিল্লার বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার সিমরাইল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল গণি ভূঁঞা ও মাতার নাম জাহানারা খানম। তাঁর বাবা ও কসবা এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন।[২০৫] তাঁর স্বামী অধ্যক্ষ, ধানমন্ডি ল'কলেজ, সদস্য ও চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ কমিটি, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল। পাশাপাশি, তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তিনি ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে প্রধান কৌসুঁলি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[২০৬]

খ. রাজনৈতিক জীবন

১৯৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ঐ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আহত তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি

[২০৪] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত।
[২০৫] মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা: ১৪৬।
[২০৬] *বিজনেস বাংলাদেশ.কম*, প্রাগুক্ত।

আব্দুর রউফসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীদের ছাত্রীদের কমনরুমে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।[২০৭] ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় যেখানে মমতাজ বেগম অংশগ্রহণ করেন।[২০৮] এরপর, তিনি ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের্র ঐতিহাসিক ভাষণে উপস্থিত হন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায়, পরবর্তীকালে তিনি একজন সক্রিয় সংগঠক ও নেত্রী হিসেবে তৎকালীন পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ), স্বাধীন বাংলাদেশে গণপরিষদের সদস্য (এমসিএ) এবং ১৯৭৩ সালে সংসদ সদস্য (এমপি) ছিলেন।[২০৯]

এছাড়া, মমতাজ বেগম ছিলেন কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের প্রাক্তন ভিপি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেত্রী এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় অন্যতম নেত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পেশায় অধ্যাপনা করেছেন। উপাধ্যক্ষ হিসেবে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে অবসরে যান। পাশাপাশি, তিনি আইন পেশায়ও নিয়োজিত ছিলেন।

খ. একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে মমতাজ বেগম

বঙ্গবন্ধুরর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর বাড়ি মরিচা হাউজে মহিলাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক পরিচর্যার ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং প্রদান করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পরে কসবায় নিজ বাড়িতে তাঁর ভাই, বাবা ও ছাত্রলীগের সদস্যদের নিয়ে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ও ছুটিতে আসা সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসা সিগন্যাল কোরের মেজর বাহারকে একটি বাহিনী গঠন করতে সহযোগিতা করেন।[২১০]

পরবর্তীতে, ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে প্রবাসী মুজিবনগর সরকার গঠনের সময় ভারতের আগরতলা সার্কিট হাউজে জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মমতাজ বেগম। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চলীয় বিএলএফ (মুজিব বাহিনী)-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

---

[২০৭] সেলিনা হোসেন, অজয় দাসগুপ্ত ও রোকেয়া কবির, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে (১ম খণ্ড)*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৮। পৃষ্ঠা: ১৯৪-১৯৫।

[২০৮] দৈনিক সংবাদ, ৩ মার্চ, ১৯৭১।

[২০৯] মোতাহের হোসেন মাহবুব, *যুদ্ধদিনের কথা*, বিনয় সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৪১।

[২১০] *বিজনেস বাংলাদেশ.কম*, প্রাগুক্ত।

বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) পূর্বাঞ্চলীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন মমতাজ বেগম। কর্নেল এম.এ.রব, চীফ অব ষ্টাফের সহযোগিতায় শেখ ফজলুল হক মনির সঙ্গে আগরতলায় বিএসএফের হেডকোর্য়াটারে হালকা অস্ত্র ব্যবহার ও যুদ্ধ পরিচালনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন মমতাজ বেগম।[২১১]

বিএলএফের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদান প্রদান করার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। আগরতলার বিশালগড়ে বিএলএফের ভাড়া বাড়ীতে শেখ ফজলুল হক মনি ও মমতাজ বেগম তাঁর বাবা-মা'সহ থাকতেন। গুরুত্বপূর্ন ও গোপনীয় সভা ও যোগাযোগ সব এ বাড়ি হতেই হত। জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী ও সেনা কর্মকর্তারা ঐ বাড়িতেই যোগাযোগ করতেন। বাংলাদেশের ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় খবরা খবর এখানেই পাঠানো হত। বি.এল.এফের প্রয়োজনীয় সব অর্থ মমতাজ বেগমে কাছেই রক্ষিত থাকত। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের অভ্যন্তর থেকে নির্যাতিত মহিলাদের সহযোগিতার জন্য এখানে খবর পাঠানো হতো। প্রয়াত সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের স্ত্রী শ্রীমতি গৌরি ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় তাদের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের সময় কসবা এলাকায় শরণার্থীদের মধ্যে যারা ক্যাম্পে থাকেননি তাদের রেশনের ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে উদ্বুদ্ধকরণে অংশ নেন মমতাজ বেগম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম চলতে থাকে। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সদিচ্ছা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত মহিলাদের পূনর্বাসনের জন্য বিচারপতি কে এম সোবাহানের নেতৃত্বে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠিত হলে মমতাজ বেগম ঐ বোর্ডের সদস্য পরিচালক হন এবং তখনই বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের পুর্নবাসনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মমতাজ বেগম কসবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও নারী পুনর্বাসন বোর্ড, কসবা'র প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৭২ সালে গণপরিষদের সদস্য(এমসিএ) হিসেবে মমতাজ বেগম বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় সহযোগিতা ও স্বাক্ষর করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ মহিলা ফ্রন্ট এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ এর যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হন। মমতাজ বেগম জাতীয় আইনজীবী সমিতির প্রাক্তন সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক। তিনি প্রাক্তন সহ-সভাপতি বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) এসোসিয়েশন। মমতাজ বেগম ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সদস্য, লিগ্যাল এইড কমিটির

[২১১] মোতাহের হোসেন মাহবুব, *যুদ্ধদিনের কথা*, *প্রাগুক্ত।*

চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে সহ-সভানেত্রী হিসেবে নারী ও সমাজের অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রামে নিয়োজিত।

১৯৯৬ সাল থেকে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিরক্ষা পরিষদ এর সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদ এর সদস্য, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য, রেডক্রস সোসাইটি বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট-এর আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলমনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর আজীবন সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর আজীবন সদস্য। তিনি অধ্যাপক সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক।[২১২]

মমতাজ বেগম ১৯৭২ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন আহাম্মদ এর নেতৃত্বে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন এর আঞ্চলিক কনফারেন্সে (সিডনি, অস্ট্রেলিয়া) যোগদান করেন, ১৯৭৪ সালে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মমতাজ বেগম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, নারী প্রগতি সংঘ, নৌ কমান্ডো এসোসিয়েশন ও নারীকণ্ঠ থেকে সম্মাননা লাভ করেন।[২১৩]

অবশেষে, তিনি ১৬ মে ২০২০ তারিখ রোজ শনিবার দিবাগত রাত ১২.১৫ মিনিটে রাজধানীর ভূতের গলি এলাকায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়।[২১৪]

শেষত বলা যায়, মমতাজ বেগমের জীবনের দীর্ঘ সংগ্রাম, অভিজ্ঞতা ও নানা অর্জন বর্তমান প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হবে।

[২১২] *বিজনেস বাংলাদেশ.কম*, প্রাগুক্ত।
[২১৩] *বিজনেস বাংলাদেশ.কম*, প্রাগুক্ত।
[২১৪] *সমকাল*, ১৭ মে, ২০২০।

৭.১.৩ মুক্তিযোদ্ধা ফোরকান বেগম

ক. জন্ম ও বেড়ে ওঠা:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নারী অংশগ্রহণ করেন। ফোরকান বেগম তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও গেরিলানেত্রী। দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি রণাঙ্গনের গেরিলা নেত্রী হিসেবে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২১৫] ফোরকান বেগম নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে ১৯৫০ সালের ৬ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো. তমিজ উদ্দীন ভুঁইয়া এবং মাতার নাম রোকেয়া বেগম।

তিনি ১৯৬৬ সালে ঢাকা কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং ঢাকা সরকারি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে এইচ.এস.সি পাস করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন।[২১৬]

খ. মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে বলেন,[২১৭]

> ‘তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলাম। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে পরবর্তী আন্দোলন মুখর দিনগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মিছিল-মিটিং করেছি। এছাড়া, স্থানীয় পরিষদগুলোর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। ঢাকায় গোয়েন্দাগিরি ও গেরিলা হামলার জন্য বিশেষ বাহিনী তৈরি করে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে, সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের মাঠে এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়ামাগারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি।
>
> এছাড়া, আত্মঘাতী হামলার জন্যও কিছু ছেলে-মেয়েকে প্রস্তুত করা হয়। এর মধ্যে ইয়াহিয়া যখন ঘোষণা দিলেন, অধিবেশন স্থগিত করা হলো তখন পহেলা মার্চ আমরা বিক্ষোভে ফেটে

[২১৫] *যায় যায় দিন*, ২৫ এপ্রিল, ২০২২।

[২১৬] *উইমেন নিউজ ২৪. কম*, ১৭ মার্চ, ২০২১।

[২১৭] *উইমেন নিউজ ২৪. কম*, প্রাগুক্ত।

পড়ি। ২রা মার্চ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছি। এরপর, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের সময় সেনা-পুলিশ তো আমাদের পক্ষে ছিল না। তখন আমরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রাজ্জাক ভাইয়ের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে টুপি বানিয়ে সেই টুপি পরে হাতে লাঠি নিয়ে ঐ জনসভা নিয়ন্ত্রণ করেছি। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস ছিল। অন্যান্য বছর পাকিস্তানি সেনা সদস্যরা এই দিবসটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করলেও ১৯৭১ সালে তারা পূর্ব-পাকিস্তানে দিবসটি পালন করেনি।'

তিনি আরও বলেন[২১৮],

'বরং স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, আমরা যারা সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলাম তারা ২৩ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে বর্তমান পল্টন ময়দানে হাজির হয়ে প্যারেড করবো। সেখানে আমরা কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী হাজির হয়ে সশস্ত্র প্যারেড করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতাকে সালাম জানাই। আমি প্যারেডে সামনের সারিতে থেকে সালাম দিয়েছিলাম। সেখানেই ছাত্রলীগের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা কামরুল আলম খসরু প্রথম উপরের দিকে বন্দুকের গুলি ফায়ার করে প্যারেড শুরু হওয়ার আগে মূল বড় পতাকাটি উত্তোলন করেন। আমরা এসব কর্মসূচি আগে প্রচার না করলেও সেদিন পল্টন ময়দানের চারদিকে হাজার হাজার মানুষ হাজির হয়ে আমাদের প্যারেড উপভোগ করেছে এবং করতালি দিয়ে উৎসাহিত করে। আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে খালি পায়ে বন্দুক কাঁধে নিয়ে এবং পতাকা নিয়ে প্যারেড করে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িতে যাই। কিন্তু প্রচন্ড ভিড়ের কারণে আমরা বঙ্গবন্ধুর হাতে সেই পতাকাটি তুলে দিতে পারিনি। আ.স.ম আব্দুর রব পতাকা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেন। বঙ্গবন্ধু পতাকাটি নিয়ে উঁচু থেকে জনতাকে সেটি দেখান। এছাড়া, সেদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষ নিজেদের বাড়িতে, দোকান-পাটে, নৌকায়, গাড়িতে এমনকি গাছের উপরও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। আমরা সেদিনই মনে করেছিলাম, আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম'

[২১৮] *উইমেন নিউজ ২৪. কম*, প্রাগুক্ত।

গ.মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট নামে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নিরীহ বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা শুরুর পর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। ফোরকান বেগম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ছাত্রী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই তিনি তাঁর নিজ গ্রাম রূপগঞ্জের পুটিনাতে চলে যান। তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আহ্বান জানান। তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখান। তিনি পুটিনা গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে নিয়ে যুদ্ধকালীন কাজ শুরু করেন। স্বতঃস্ফূর্ত জনতাকে ১০টি সাব-কমিটিতে ভাগ করা, শরণার্থী সেবা, সাব-কমিটি, ইনফর্মার গ্রুপ, স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, রাতে এলাকায় পাহারা দেওয়া, সিলেকশন ও প্রশিক্ষণ কমিটি প্রভৃতির ন্যায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এ সম্পর্কে তিনি জানান[২১৯],

> ‘সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গ্রামে একজন বিমান বাহিনীর এবং দুইজন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের সহায়তায় সেখানে খুব ভোর থেকে কলার ডগা এবং মানকচুর বড় বড় গাছ কেটে এনে সেগুলো ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর জমি থেকে মাটির ঢেলা এনে গ্রেনেড চালানো শেখানো হয়। গ্রামের প্রশিক্ষিত তরুণদের সমন্বয়ে আমরা দশ ধরণের কাজের জন্য দশটি বাহিনী গড়ে তুলি।’

পরবর্তীতে, তিনি শরণার্থী শিবিরগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত মটিভেশনাল বক্তৃতা দিতে থাকেন। আলোচনা সভা করে তাদের মনোবল ঠিক রাখার ব্যবস্থাও করেন। যা শিবিরগুলোতে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আসে। এছাড়া, তিনি গেরিলা ক্যাম্পে হোচিমিন, চেগুয়েভারা, নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, কামাল আতাতুর্ক, মাও সে তুং, লেলিন, ফিদেল কাস্ত্রোসহ বিশ্বের সংগ্রামী নেতাদের জীবন কাহিনী ও সংগ্রামের ওপর লিখিত পুস্তকাদি পড়ে শোনাতেন। পাশাপাশি, তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের শরণার্থী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া, রক্ত ও ওষুধ জোগাড় করে হাসপাতালে ভর্তি করাসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কাজ ও করতেন।

[২১৯] *উইমেন নিউজ ২৪. কম*, প্রাগুক্ত।

এরপর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারী নেত্রী, ছাত্রীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গড়ে ওঠে ১৯৭১ সালের ১০ জুলাই। স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর প্রধান ছিলেন জাহানারা হক, সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন ফোরকান বেগম।[২২০]

তারপর, তিনি কমিটি ও স্কোয়াডের কাজে রাত-দিন ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন আগরতলার চিপ মিনিস্টারসহ বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের অনেকেই তাকে এক নামে চিনতে শুরু করেন।[২২১]

বিটগড়ে আটকা পড়লে সেখানকার রাজাকার নেতাকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য রাজি করেন। পরবর্তীকালে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা জন এফ কেনেডির কাছে যুদ্ধ পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন[২২২],

> ‘আগরতলায় যাওয়ার জন্য মনি ভাই লিখলেন, অনেকে আহত হয়েছে, এখানে সেবিকার অভাব। আমি যেন আমার সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছাই। তখন আমি এবং আমার চাচাতো বোন নাসু মামুর সাথে আগরতলা রওয়ানা করি। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্য বিটগড়ে গিয়ে আটকে গেলাম। সেখানে পৌঁছে শুনলাম, পাকিস্তান সেনারা আগেই ওই গ্রাম থেকে মানুষদের ধরে নিয়ে গেছে। তারা কিছু বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে সাত-আটদিনের জন্য আটকা পড়ে গেলাম। কারণ সিএন্ডবি রোড দিয়ে পার হওয়া যাচ্ছে না। পাকিস্তান সেনারা খুব কড়াকড়িভাবে টহল দিচ্ছে। তার উপর প্রচণ্ড বর্ষা। ঐ অবস্থায় আমরা সেই এলাকায় যে রাজাকার বাহিনীর প্রধান এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল, ভুলক্রমে তার বাড়িতে গিয়ে উঠি। তবে আমরা সেখানে যে ক'দিন ছিলাম সে সময়ে তাকে অনেক করে বুঝিয়েছি এবং তার যে বাহিনী ছিল রাজাকার, সংবাদ বাহক এবং নৌকার মাঝি তাদেরও আমরা বুঝিয়েছি যেন তাঁরা পাকিস্তানিদের সহায়তা না করে বরং তাদের সাথে খাতির রাখে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আগরতলা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। আবার একই সাথে যেসব মুক্তিযোদ্ধা আগরতলা থেকে আসছে তাদেরও যেন সহায়তা করে - সেজন্য তাদের রাজি করালাম। এরপর আমরা আগরতলা গেলাম। ইতোমধ্যে, সেই শান্তি কমিটির প্রধান তার দুই ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।’

[২২০] *যুগান্তর*, ২২ মার্চ, ২০২১।
[২২১] *সময়ের আলো*, ২২ মার্চ, ২০২১।
[২২২] *উইমেন নিউজ ২৪. কম*, প্রাগুক্ত।

আগরতলায় গিয়ে জিবি হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে এবং শরণার্থী শিবিরে সেবা দিয়েছেন ফোরকান বেগম। মার্কিন সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড এম কেনেডি সেখানে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে গেলে তিনি এবং মিনারা বেগম কেনেডির কাছে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এসময় কেনেডির কাছে তিনি বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন এবং কেমন আছেন সেসব তথ্য জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধে পরবর্তী সাতদিনের মধ্যেই জন এফ কেনেডি বঙ্গবন্ধুর অবস্থান এবং অবস্থা সম্পর্কে জানান। বঙ্গবন্ধুর খবর জানার পর, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবকসহ সবাই আরো বেশি উৎসাহিত হন এবং যুদ্ধের কাজে আরো মনোযোগী হন।

এছাড়া, লেম্বুছড়া শিবিরে বাছাই করা আট-দশজন সাহসী নারীকে নিয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ শুরু হলে সেখানে প্রশিক্ষণ নেন ফোরকান বেগম। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এই বিশেষ বাহিনীর সদস্যদের দেশের ভেতরে গেরিলা হামলার জন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন। সেজন্য ফোরকান বেগম এবং তাঁর সঙ্গিরা সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই, খালেদ মোশাররফ জানান, ফোরকান বেগমের ছবি পকেটে নিয়ে তাকে খুঁজছে পাকিস্তান সেনারা। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ঘাতক স্পাই প্রেরণ করা হলেও তিনি দমে যাননি। পূর্বের মতন নিজের দায়িত্বে পালন করেছেন। মৃত্যু ভয় তাঁকে দায়িত্ব থেকে চ্যুত করতে পারেনি, বরং তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন যুদ্ধকালীন প্রতিটি সময়ে।[২২৩]

ঘ. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী জীবন

ফোরকান বেগম স্বাধীন দেশে ফিরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী আবার লেখাপড়া শুরু করেন। পরবর্তীতে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর, তিনি সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। চাকুরি জীবনে শ্রম মন্ত্রণালয়, যুব মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরির পাশাপাশি তিনি বাংলা একাডেমি, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, সার্ক এর সদস্য দেশসমূহের গৃহস্থ কর্মীদের সমিতি সাবাহ, লায়ন্স ক্লাব, জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থাসহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।[২২৪]

[২২৩] *যায় যায় দিন*, ২৫ এপ্রিল, ২০২২।
[২২৪] *উইমেন নিউজ ২৪. কম*, প্রাগুক্ত।

৭.২ মুক্তিযোদ্ধা স্বর্ণলতা ফলিয়া

১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশের পরিচিতি পেয়েছে। এই স্বাধীন দেশের পিছনে রয়েছে অনেক সাহসী মুক্তিযোদ্ধার রক্ত। তাঁদের সাহস, ত্যাগ আমাদের এনে দিয়েছে এই স্বাধীনতা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে দেশের জন্য লড়েছেন। অনেক নারী সাহসের সাথে মুখোমুখি হয়েছেন শত্রুদের। কখনো সামনে থেকে আবার কখনো আড়ালে থেকে। অনেক সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধার নামই আমরা জানি না, হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া। এমন একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা হলেন মুক্তিযোদ্ধা স্বর্ণলতা ফলিয়া। যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের হয়ে লড়েছেন।[২২৫] সশস্ত্র যুদ্ধে তিনি বেশ কয়েকটি অপারেশ করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। তিনি হরিণাহাটি, ঘাঘর, কলাবাড়ি, রামশীল এবং পয়সারহাট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২২৬]

স্বর্ণলতা ফলিয়া ১৯৫৪ সালের ৬ অক্টোবর গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলার সোনাইলবারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নিশিকান্ত ফলিয়া এবং মায়ের নাম মারিয়া ফলিয়া। তাঁর বাবা ছিলেন একজন কৃষক। বাবা-মায়ের সাত সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম।[২২৭]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কোটালিপাড়া উপজেলার নারিকেলবাড়ী মিশনারি স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়তেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর। একদিন মাঠে খেলার সময় নারী মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য তাঁকে এসে বললেন, 'দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আমিতো যুদ্ধ করবো। তোরা কে কে আমার সাথে যুদ্ধে যাবি।'

এ কথা শুনে স্বর্ণলতা আর চুপ থাকতে পারলেন না। এক কথায়ই রাজি হয়ে গেলেন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। স্বর্ণলতা ফলিয়া ৮ নং সেক্টরে কোটালীপাড়া সীমানা সাবসেক্টর কমান্ডার হেমায়েত বাহিনীর অধীনে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগে আশালতা বৈদ্যের সাথে যুদ্ধের সহপাঠী বন্ধুরা মিলে এলাকায় ঘুরতেন আর মহিলা মুক্তিযোদ্ধা জোগাড় করতেন। আশালতা বৈদ্য ৪৫ জন নারীকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড তৈরী করেছিলেন এবং ঐ কমান্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আশালতা বৈদ্য নিজেই।

---

[২২৫] *সমকাল*, ০৮ জানুয়ারি, ২০১৭।

[২২৬] *সাক্ষাৎকার*: আশালতা বৈদ্য (সহযোদ্ধা), ২২/দিলকুশা/ সূর্যমুখী সংস্থা/ মতিঝিল, ঢাকা। তারিখ: ০৪ জুন, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন-লাবনী ইসলাম চুমকী।

[২২৭] *সাক্ষাৎকার:*প্রভাত রায়(সহযোদ্ধা), নাড়িকেল বাড়ি ক্যাথলিক মিশন, তারিখ: ০৫মার্চ, ২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন-লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মামুন-অর-রশিদ।

স্বর্ণলতা ফলিয়া ও তাঁর দল সুযোগ পেলেই বন্ধুদের সাথে ঘরের মা-বোনদের নিয়ে স্লোগান দিতেন

"অস্ত্র ধরো, স্বাধীন বাংলা রক্ষা করো"।

এরপর, জুন মাসে গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু হলে তিনি হেমায়েত বাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জানা যায়, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি গ্রামের হিন্দু পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। স্বর্ণলতা ফলিয়ার মা বাড়িতে লুকিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাবার দিয়ে সাহায্য করতেন।

সশস্ত্র যুদ্ধে তিনি বেশ কয়েকটি বিপদজনক অপারেশ করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। একবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঁচটি লঞ্চ কাইজুর নদীর তীরে ছিল। স্বর্ণলতাসহ ১২-১৩ জনের একটি দল গিয়ে পানিতে ডুবে ডুবে লঞ্চগুলোর তলা ছিদ্র করে দিয়েছিলেন। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তাদের সহযোগী দেশীয় রাজাকারসহ লঞ্চগুলো ডুবে যায়।[২২৮]

আরেকটি অপারেশন করেছিলেন নদীতে। এই অপারেশনে তাঁর পাশে থাকা দুই মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং বীরবিক্রম হেমায়েতউদ্দিনের গালে গুলি লাগে।[২২৯]

এরপর, দেশ স্বাধীন হলে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম শুরু করেন স্বর্ণলতা ফলিয়া। স্বাধীনতার পরে আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে ঢাকা মেডিকেলে এসে কাজের সন্ধান করতে থাকেন তিনি। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অসুস্থ বীরাঙ্গনাদের সহযোগিতা করার জন্যে মেডিকেলে কোনো রকমে তাঁর খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

পরবর্তীতে, বঙ্গবন্ধু বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে স্বর্ণলতা ফলিয়া তখন রাস্তা ও অন্যান্য জায়গা থেকে মন্ত্রণালয়ে ঘোরাঘুরি করে বীরাঙ্গনাদের চাকরির চেষ্টা করেন। তাদের চিকিৎসাসহ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করেন।[২৩০]

---

[২২৮] *সাক্ষাৎকার:* আশালতা বৈদ্য, প্রাগুক্ত।
[২২৯] *সাক্ষাৎকার:* প্রভাত রায়, প্রাগুক্ত।
[২৩০] *সমকাল*, প্রাগুক্ত।

দুঃখের বিষয় হলো যে, আমরা অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তাঁদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে পারিনি। এটি আমাদের ব্যর্থতা। অনেক সাহস নিয়ে তিনি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের এই সাহসকে সর্বোচ্চ সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

৭.৩ মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি আপামর জনতার পাশাপাশি রাখাইন মেয়ে প্রিনছা খেঁ অংশগ্রহণ করেন। তাঁর আদিনিবাস ছিল টেকনাফে। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে প্রলয়কারী জলোচ্ছ্বাস আঘাত আনে যার দরুন উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে, প্রিনছা তাঁর আদিনিবাস হারায়। তাঁর পিতামাতা, পরিবারবর্গ সবাইকে হারিয়ে তখন তিনি ঐ এলাকায় যাওয়া একটি মেডিকেল টিমের সান্নিধ্যে যায়। তিনি মেডিকেল টিমের সাথে উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সেবায় নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ মেডিকেল টিমটির সাথে তিনি বরিশাল উপকূলীয় অঞ্চল কুয়াকাটা সৈকত এলাকায় যান। সেইখানে তিনি সুরেন বাবু নামের একজন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতার কাছে আশ্রয় পান।[২৩১]

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাথরঘাটা থানায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত নেতা কর্মীদের ধরপাকড় শুরু করে। তখন, সুরেন বাবু গ্রেফতার হন। তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে, ঐ সময় প্রিনছা খেঁ-কে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে যায় বাউকাঠি গ্রামে অবস্থিত সেনা ক্যাম্পে। তাঁর উপর নেমে আসে শারীরিক নির্যাতন। প্রিনছা খেঁ প্রতিবাদী চরিত্রের সাহসী মেয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর উপর আরোপিত অবস্থানের পরিবর্তনে প্রতিশোধমূলক পরিকল্পনা শুরু করেন। শুরুতে তিনি স্বেচ্ছায় তাদের মনোরঞ্জন করে। তারপর, তাদেরকে বাঙালি সুস্বাদু খাবার-ভাত, মাছ, ভর্তা রান্না করে খেতে দেন। এরপর, অমায়িক আচরণ ও মধুর অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে ক্যাম্পে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করেন। এক্ষেত্রে, তিনি এতটাই বিশ্বস্ত হন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরাই তাকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র খোলা, অস্ত্র লাগানো, অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেন। পাশাপাশি, ঐ সময়ে তিনি তাঁর সহযোগী হিসেবে ক্যাম্পে জ্বালানী কাঠ সরবরাহকারী

[২৩১] মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়া, জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা: ৫৪।

বাবুল নামের একজন স্থানীয় বাঙালির সাথে মিত্র জোট গঠন করেন। ক্যাম্পের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যার পরিকল্পনা করেন।[২৩২]

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি অসুস্থতার ভান করে।

তিনি ক্যাম্পের সুবেদারকে জানান যে,

'তিনি মনে হয় গর্ভবতী'।

ঝালকাঠিতে তাঁকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ফলে, সেনা প্রহারায় তাঁকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয়।

ডাক্তার কনফার্ম করেন যে,

'প্রিনছা খেঁ অন্তস্বত্ত্বা'

এবং তাঁর অনুরোধে ডাক্তার পাকিস্তানি হাবিলদারকে আরও জানান যে,

'গর্ভপাত ছোট ভ্রুণে সম্ভব নয় বলে তাঁকে কয়েকবার ডাক্তারের কাছে আসতে হবে।'

পরবর্তীতে, কয়েকবার যাওয়া-আসার পর তিনি ডাক্তারকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান যে, তাঁকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যার জন্য স্বাদ-গন্ধহীন বিষ দিতে হবে। প্রথমে, ডাক্তার রাজি হন নি। সেক্ষেত্রে, তিনি ডাক্তার ও তাঁর পরিবারকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বারা হত্যার হুমকী দেন। তারপর, ডাক্তার রাজি হন। তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি কয়েক দিন সময় চান। পরে, ডাক্তার বরিশাল সদর থেকে বিষ সংগ্রহ করে প্রিনছা খেঁ কে দেন।[২৩৩]

এরপর, তিনি সংগ্রহকৃত বিষ রাত্রের খাবারের সাথে মিশিয়ে দেন। তারপর, বিষ মিশ্রিত খাবার সুন্দরভাবে পাশে বসে ক্যাম্পের পাকিস্তানি সৈন্যদের পরিবেশন করেন। সেই খাবার খেয়ে ৪২ জন সৈন্য অচেতন হয়ে যায়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রিনছা খেঁ সহযোগী বাবুলের সাথে পালিয়ে যায়। প্রথমে তাঁরা নাজিরপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যান। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের না পেয়ে লঞ্চে করে বরিশাল যান। বরিশালে যাওয়ার পর তিনি জানতে পারেন বাউকাঠি ক্যাম্পের ৪২ জন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ১৪ জন অচেতন অবস্থায় মারা গেছেন। অন্যদের সংকটাপন্ন অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারা প্রিনছা খেঁ-কে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছে। বরিশালের সর্বত্র অঞ্চলে তল্লাসি চালানো হচ্ছে। ফলে,

[২৩২] মেসবাহ কামাল, জান্নাত-এ-ফেরদৌসি, *অশ্রু-সাগরে মিলিত প্রাণ*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা: ১০১।

[২৩৩] মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়া, *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৫।

প্রিনছা খেঁ বরিশালে থাকা নিরাপদ না ভেবে দুইদিন বরিশালে পালিয়ে থেকে ঢাকায় আসেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি আবার বরিশালে ফিরে যান।[২৩৪]

৭.৪ একাত্তরের রণাঙ্গনে বরিশালের পেয়ারা বাগানঃ সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ করেছিল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী ছাড়া কোনো গ্রাম ছিল না। তদ্রূপ, বরিশালের পেয়ারা বাগান অঞ্চলের নিরস্ত্র জনগণ বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিরুদ্ধে। বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলের ৪টি থানা ঝালকাঠি, বানারিপাড়া, স্বরুপকাঠি ও কাউখালীর ৬২ টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হয় পেয়ারা বাগান। যার বিস্তৃতি ছিল ৭২ মাইল। ১৯৭১ সালের ২মে এই পেয়ারা বাগান স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, এটি ছিল পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। যা ১ নং ফ্রন্ট এরিয়া হিসেবে সুপরিচিত ছিল। এর হেডকোয়ার্টার ছিল ভিমরুলীতে। এছাড়া, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছিল আটঘর, কুরিয়ানা, পূর্ব জলাবাড়ী, বাউকাঠি, কীর্তিপাশা ও ডুমুরিয়া। পেয়ারা বাগানের এই ১ নং ফ্রন্ট এরিয়ার পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন বেগম জাহানারা। তিনি একজন কথাশিল্পী ও পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নের্তৃস্থানীয় কর্মী। তিনি ছিলেন 'পূর্ববাংলা জাতীয় মুক্তিবাহিনীর' প্রতিষ্ঠাতা কার্যকরী সদস্য। তাঁর স্বামীর নাম সিরাজ সিকদার। তিনি ছিলেন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদের সম্পাদক। তিনি ছিলেন 'পূর্ববাংলা জাতীয় মুক্তিবাহিনীর' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

পেয়ারা বাগান ঘাটি এলাকার ০১ নং ফ্রন্ট এরিয়াকে ০৮ টি গেরিলা সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। ঘাঁটি এলাকায় বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার ও গেরিলাদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ০১ টি সামরিক স্কুল ভিমরুলীতে স্থাপন করা হয়।[২৩৫]

পাকিস্তানি সেনারা যখন প্রায় ঐ অঞ্চলের দোরগোড়ায় তখন তাঁরা তরুণদের সমবেত করে আসন্ন শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য। এক্ষেত্রে বিথীকা বিশ্বাস বলেছিলেন যে,[২৩৬]

"আমরা কুকুরের মতো মরার চেয়ে লড়াই করে মরতে চাই।"

---

[২৩৪] ঐ।

[২৩৫] মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থিদের ভূমিকা (প্রথম খন্ড)*, গণপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা: ২২৪-২৩৪।

[২৩৬] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* বিথীকা বিশ্বাস, সংগ্রাহক: শারমীন মুর্শিদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর, ২০০০।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যুদ্ধের একটি হাতিয়ার হিসেবে ধর্ষণের প্রাচীন অনুশীলনকে কাজে লাগিয়েছিল। এই প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে ইতোমধ্যেই অপমান ও ভয়াবহতার গল্প পৌঁছে গিয়েছিল, যেখানে সচেতন মেয়েদের সমন্বয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই নারীদের মধ্যে কেউ কেউ বামপন্থী রাজনীতির মুখোমুখি হয়েছিল।

এই পর্যায়ে বরিশালের পেয়ারা বাগান অঞ্চলের সশস্ত্র নারীযোদ্ধা বিথীকা বিশ্বাস, শিশির কণা, মৃণালিনী রায় এবং শাহানা পারভীন শোভা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

❖ মুক্তিযোদ্ধা বিথীকা বিশ্বাস, শিশির কণা, মৃণালিনী রায় এবং শাহানা পারভীন শোভা

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বরিশাল অঞ্চল আক্রমণ করলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পুরো গ্রামটি একটি ঘন পেয়ারা বাগানে আশ্রয় নেয়। বেঁচে থাকাটাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে, যুদ্ধ তাঁদের জীবন, মর্যাদা এবং মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীতে, স্বরুপকাঠির একটি ছোট্ট গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সময় একদল তরুণী নিজেদের এবং নিজেদের গ্রামকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী গ্রামে প্রবেশের আগে ঝালকাঠি ইতোমধ্যেই একটি সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।[২৩৭]

বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, শাহানা পারভীন শোভা ছিলেন ক্যাপ্টেন বেগের সৈন্যদলের সদস্য। তিনজন শিক্ষিত মেয়ে কৈশোরের শেষের দিকে, মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার থেকে বরিশালের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল বরাবর অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রতিরোধে যোগ দিয়েছিল।

বরিশালে তাঁদের কমরেড ছিল তোফাজ্জল হক, পরিমল ঘোষ এবং বুলু। সেক্টর ৯-এর কমিউনিকেশন অফিসার ছিল ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আলতাফ হোসেন এবং সেক্টর স্টাফ অফিসার ছিলেন ওবায়দুর রহমান মুস্তফা।

সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের অধীনে টাকিতে মহিলাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প শুরু হয়। তাঁরা ঐ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সাথে শতাধিক মহিলা সশস্ত্র লড়াই এবং গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ নেন। এই অল্পবয়সী

[২৩৭] ঐ।

মেয়েদের গুপ্তচরবৃত্তি এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেনানিবাস এবং রাজাকারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।[২৩৮]

মৃণালিনী রায় ছিলেন চৌদ্দ বছরের কম বয়সী মেয়ে যিনি গুপ্তচর দলে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বোরখা পরতেন, রাজাকারদের বাড়িতে যেতেন। শান্তি কমিটি যা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য কাজ করতো সে বিষয়ে তিনি তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি শান্তি কমিটির বাড়িতে যেতেন, তাদের স্ত্রীদের বন্ধু হতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতেন। উল্লেখ্য, মৃণালিনীর মতো অন্য অল্পবয়সী মেয়েরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতেন, সবসময় সায়ানাইড বহন করতেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল–

'ধরা পড়লে শত্রুর হাতে কষ্ট না পেয়ে আত্মহত্যা করতে হবে।'

শাহানা পারভীন শোভা ছিলেন ১৯-২০ বছর বয়সী একজন সাহসী নারী যিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনানিবাসের সেনা ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। এরকম একটি অপারেশনের সময় তিনি এবং তাঁর গ্রুপ ধরা পড়েন। তাঁকে অত্যাচার করা হয়েছিল এবং লাঞ্ছিত করা হয়েছিল কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয়নি।

ক্যাপ্টেন বেগের মতে,

'এই অপারেশনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং
তাদের অনেক মিশন ছিল এই মেয়েদের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে।'

নয় মাস যুদ্ধের সময় বীথিকা বিশ্বাস এবং শিশির কণা যৌথভাবে তাঁদের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল এবং ক্যাপ্টেন বেগের অধীনে বেশ কয়েকটি বিপজ্জনক অপারেশন পরিচালনা করেন। একদিন বিথিকা বেয়নেট চার্জ করে একজন রাজাকারকে হত্যা করেছিল।

সেকেন্ড ইন কমান্ড তোফাজ্জল হোসেন তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে[২৩৯],

> "আমাদের একসাথে মিছিলে আমরা শীঘ্রই ভুলে গিয়েছিলাম যে বীথিকা এবং শিশির মহিলা ছিলেন যখন তারা আমাদের সাথে মাইল মাইল হেঁটেছিল, ভারী অস্ত্র বহন করেছিল এবং আত্মঘাতী স্কোয়াডে যোগ দিয়েছিল। তাঁরা ছিল অস্ত্রধারী আমাদের কমরেড।"

[২৩৮] *সংগৃতিহ সাক্ষাৎকার*: বিথীকা বিশ্বাস, প্রাগুক্ত।
[২৩৯] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: সেকেন্ড ইন কমান্ড তোফাজ্জল হোসেন, সংগ্রাহক: শারমীন মুর্শিদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর, ২০০০।

এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন বেগ স্বীকারোক্তি দেন যে[২৪০],

"বীথিকা ছিল তাঁর সেরা পুরুষদের একজন,
তাঁর ছেলেদের চেয়ে বেশি সাহসী।"

যখন সাব-সেক্টর কমান্ডার, ক্যাপ্টেন বেগ তাঁর সৈন্যদের ডেকেছিলেন, একটি আত্মঘাতী স্কোয়াডের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের চেয়েছিলেন যেটি পাকিস্তানি সৈন্যদের বহনকারী একটি গানবোট উড়িয়ে দিতে হবে, বিথিকা এবং শিশিরই প্রথম স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলেন যেখানে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধারা ইতস্তত করেছিল।বিথীকা বিশ্বাস ও শিশির কণা ছিল দুই তরুণী মুক্তিযোদ্ধা যাদের বয়স প্রায় ১৯ বছর এবং তাঁরা ছিল দোহারা গড়নের। অত্যন্ত সাহসী মুক্তিযোদ্ধা।

দিনটি ছিল ১১ জুলাই, ১৯৭১। জায়গাটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে শরূপকাঠির একটি গ্রাম। এটি ছিল অন্ধকার এবং কঠিন বৃষ্টি, এবং কঠোর বর্ষার রাতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। লঞ্চগুলো কোচা নদীর ঘাটে (নদীর তীরে) অবস্থান করে। মাঝখানের লঞ্চটি ছিল পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন এরশাদকে বহনকারী একটি গানবোট। উল্লেখ্য, ক্যাপ্টেন এরশাদ পিরোজপুরে আসার সাত দিনের মধ্যে নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিক, নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে দক্ষিণের অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

দুই তরুণী মুক্তিযোদ্ধা বিথীকা বিশ্বাস ও শিশির কণা চুপিচুপি হেউলি বনের মধ্য দিয়ে কোচা নদীর তীরের দিকে চলে গেল। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বহনকারী লঞ্চটি উড়িয়ে দেওয়া। দুটি রিভলবার এবং গ্রেনেড বহন করে, যখন তাদের সহযোদ্ধারা স্বেচ্ছাসেবক হতে ব্যর্থ হয় তখন এই তাঁরা অপারেশন করার সাহস করে। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত লঞ্চে পৌঁছাতে তাঁদের জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। তাঁরা এটি উড়িয়ে দেওয়ার আগে শত্রুর গজের মধ্যে থাকতে হবে। রোভিং সার্চলাইটগুলি প্রায়ই জায়গাটিকে আলোকিত করে। কঠিন বৃষ্টি আর জলে ভাসমান জলাশয় ছিল আশীর্বাদ। যখন সার্চলাইটটি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তখন তাদের অন্ধকারে সাঁতার কেটে লঞ্চে পৌঁছাতে হবে, এক সময়ে তাঁদের কয়ে সেকেন্ড অন্ধকার দেয়। পানিতে মাছের মত, নদীর দেশ থেকে এই মেয়েরা দ্রুত মাঝখানে লঞ্চের কাছে পৌঁছে গ্রেনেড দিয়ে হামলা চালায়। তৎক্ষণাৎ জবাবে

[২৪০] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:*ক্যাপ্টেন বেগ, সংগ্রাহক: শারমীন মুর্শিদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর, ২০০০।

নদীতে শত শত রাউন্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। সেদিন মেয়েরা বেঁচে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন এরশাদ বেঁচে গেলেও তাঁর কয়েকজন লোক হতাহত হয়।

পরবর্তীকালে, বীথিকা স্বীকারোক্তি দেন যে[২৪১],

"আমি জানি না কিভাবে আমরা সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম।
এটা একটা অলৌকিক ঘটনা ছিল।"

৭.৫ আত্মোপলব্ধি

বীথিকা বিশ্বাস এবং শিশির কনার মতো, আরও অনেক মহিলা ছিলেন যাঁরা যোদ্ধা হিসেবে লড়াই করেছিলেন, তাঁদের নিজের সতীত্ব এবং তাঁদের জাতির সতীত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন। ইতিহাস ভুলে গেছে যে নারীরা সাহসের সাথে তাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য পুরুষদের মতোই লড়াই করেছে। তাঁরা ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরা শহীদ ছিলেন। অথচ, দিনশেষে নারী তাঁরা একই ধরনের কুসংস্কারের শিকার হয়।উল্লেখ্য, তাঁরা একটি প্যারাডক্স প্রতিনিধিত্ব করে যোদ্ধা হিসেবে প্রথাগত সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমাজের প্রতিনিয়ত বাস্তবতায় তাঁরা হয় বাধ্য বা বাধ্য হয় প্রথাগত সংস্কৃতিতে ফিরে যেতে, বাধ্য হয় অজ্ঞাতনামায় এবং নীরবতায়।

বীথিকা যিনি তাঁর সমস্ত পুরুষ কমরেডদের দ্বারা তাঁর সাহসিকতার জন্য প্রশংসিত হয়েছিল, অথচ তাদের মধ্যে কেউই তাঁকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার মতো সাহস পাননি। তাঁর কমরেডদের মনে প্রশ্ন ছিল যে তিনি তার পুরুষের সাথে একটি ঘরোয়া পরিবেশে 'সঠিক' সমীকরণটি তৈরি করতে সক্ষম হবেন যেখানে তাকে 'সাবল্টার্ন' হতে হবে।

শিশির কণা আজ একজন যোদ্ধা হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে রাজি নন। পরিবার চায় সে যেন অতীত ভুলে যায় এবং তাঁদের কাছে বিব্রত না হয়। তাই, তিনি অজ্ঞাতনামায় এবং নীরবতায় বেনামিতে ডুবে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছে।

[২৪১] *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: বিথীকা বিশ্বাস, প্রাগুক্ত।

শিশির কনা আজকাল খুব কাঁদে। তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে অন্য নারীকে বিয়ে করেছে। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু আজ তাঁর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার অভাব রয়েছে। তিনি স্বাভাবিক সংসার জীবন নিয়ে একজন সাধারণ নারী হতে চেয়েছিলেন, সেনিক নয় কিংবা বীর নয়। তিনি চান না অতীত এতে হস্তক্ষেপ করুক।

শাহানা পারভীন শোভা যুদ্ধে সাহসিকতা, বন্দীদশায় নির্যাতন এবং ধর্ষণের স্বীকার, যার স্বামী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল, তাঁর কৃতিত্বের এককতা এবং অভিজ্ঞতার কারণে তাকে বাধা দেওয়া হয়নি একজন অত্যন্ত যত্নশীল ব্যক্তির সাথে সুখী বিবাহের চুক্তি করা থেকে যিনি তাকে স্বীকৃতি, সহানুভূতি, এবং সুরক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা সমাজের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক।[২৪২]

৭.৬ পরিশেষ

১৯৭১ সালের ৭-ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধেরপ্রস্তুতি ও ২৫ মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা অনুযায়ী পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধকালে নারীদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। তাঁরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও অন্যতম সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ নারী মুক্তিবাহিনীর সংগঠক। তাঁর বাড়ি মরিচা হাউজ মহিলাদের প্রাথমিক পরিচর্যা ও সামরিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীকালে, তিনি কলকাতার গোবরা ক্যাম্পের মহিলাদের গেরিলা প্রশিক্ষণের নেতৃত্বে ছিলেন। মমতাজ বেগম ছিলেন আরেকজন অন্যতম সংগঠক। তিনি ২৬ মার্চের পর কসবায় নিজ বাড়িতে ভাই, বাবা, ছাত্রলীগের সদস্য, সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে মেজর বাহারকে মুক্তিবাহিনী গঠনে সহযোগিতা করেন। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগরতলায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সদর দপ্তরে অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধ পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি, তিনি 'মহিলা সংঘ' নামে একটি সেবা সংগঠনের মাধ্যমে শরণার্থী শিবিরে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণামূলক উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করেন। একইসাথে, মুক্তিযুদ্ধে গেরিলানারীদের কথা বলতে গেলেই নাম চলে আসে ফোরকান বেগমের। তিনি ছিলেন প্রথম গেরিলা স্কোয়াড আগরতলার লেম্বুচোরা ক্যাম্পের নেতৃত্বে। শুধু সংগঠক বা নেতৃত্ব প্রদানের মধ্যে নারীদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁরা আবার কখনো কখনো রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে, মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে বরিশালের পেয়ারা বাগান অঞ্চলের বিথীকা বিশ্বাস ও শিশির কণা অসম সাহসিকতার পরিচয় দেন। তাঁরা ঐ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত, একটি অপারেশনে

[২৪২] ঐ।

মুক্তিযোদ্ধা বিথীকা বিশ্বাস ও শিশির কণা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশাল লঞ্চ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন। পাশাপাশি, ঐ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা শাহানা পারভীন শোভা গোয়েন্দাবৃত্তির মাধ্যমে পাকিস্তান ক্যাম্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনে সহযোগিতা করেন। আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধা প্রিনছা খেঁ ঐ অঞ্চলের বাউখালি ক্যাম্পে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক স্বীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধকল্পে কৌশলে খাবারের সাথে বিষ প্রয়োগ করে ক্যাম্পের অসংখ্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে হত্যা করেন। এছাড়া, গোপালগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা স্বর্ণলতা ফলিয়া হেমায়েত বাহিনীর অধীনে একাধিক সশস্ত্র অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

শেষত বলা যায়যে, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শত্রু সেনাদের আত্মসমর্পণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীসমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

অধ্যায়-৮
উপসংহার

সভ্যতার সকল অর্জন নারী-পুরুষের মিলিত কর্মেরই ফল। দক্ষিণ এশিয়ায় বিদেশি দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে নারীদের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যার একটি দৃষ্টান্ত হল চট্টগ্রামের তরুণী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর ঘটনা, যিনি ত্রিশের দশকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লড়াই করেছিলেন এবং অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণভাবে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি একজন শহীদ। তদ্রূপ, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, ইতিহাসের অন্যান্য যুদ্ধের মতো, নারীরা পুরুষদের পাশেই ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যেকটি স্তরে তাঁরা নার্স, গুপ্তচর, বাবুর্চি, অস্ত্র বাহক, প্রেরণাদাতা এবং সর্বোপরি সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।নারী মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল-দেশের স্বাধীনতা এবং এটিকে একটি প্রয়োজনীয়তা বলে তাঁরা অভিহিত করেছিলেন। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মহিলাদের সম্পর্কে খুব কম তথ্য রয়েছে। কারণ- নারীদের ইতিহাস হল নীরবে যুদ্ধে প্রবেশ এবং নীরবে চলে যাওয়া। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল যে তাঁরা যুদ্ধে লড়াই করেছিল যাতে তাদের সমাজে পুনঃপ্রবেশের সম্ভাবনা নষ্ট না হয়। কারণ- রক্ষণশীল সমাজ জানে না, ঐ যোদ্ধাদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে।

অতঃপর, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারীদের সম্মানের ব্যাজ দেওয়া হয়নি। ফলে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁদের প্রকৃত অবস্থান অনেকাংশে অদৃশ্য থেকে যায়। কিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু করা দরকার। এক্ষেত্রে, পরিতাপের বিষয় হল যে, বাংলাদেশে নারীদের সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা প্রভাবশালী একটা শ্রেণী বর্তমান অবধি বিরত রয়েছে। তাঁরা নতুন প্রজন্মকে নারীর ইতিহাস বিনির্মাণে উৎসাহিত না করে বরং যাঁরা নারীর ইতিহাস রচনা করতে চায় তাদেরকে বিভিন্ন মাধ্যমে দ্বিধান্বিত করছে। বর্তমান প্রজন্মের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

উলশ্রুতিতে, নারী মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা অনেকাংশে অকথিত থেকে যায়। এমন কোনো জায়গা তৈরি হয়নি যেখানে তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে এই সুবর্ণজয়ন্তীকালীন সময়েও যা অকথিত রয়ে গেছে। শুধুমাত্র দুই জন নারীকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ ৪ টি রাষ্ট্রীয় খেতাবের মধ্যে চতুর্থ ‘বীরপ্রতীক’ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সরকার কর্তৃক প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ১৬ খণ্ডের ইতিহাসে নারী যোদ্ধাদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি অবিশ্বাস্য স্মৃতিভ্রষ্টতা দেখায়। অনেকাংশে নারীদের বীরাঙ্গনা হিসেবে জোর দেয়। এমনকি, তাঁদের বাবা-মা তাঁদের 'অসম্মানিত' কন্যা এবং স্বামী তাঁর স্ত্রীদের পরিবারে ফিরিয়ে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। নারীদের ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে একটি ফাঁদ তৈরি করেছিল, যা দূর হবে না। অতঃপর, স্বাধীনতার পর এই নারীরা তাঁদের জীবনে ফিরে যায়। অনেকাংশে তাঁরা দারিদ্র্যময় জীবন অতিবাহিত করে। এক্ষেত্রে,জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা সমাজের দায়িত্ব।

বর্তমান সরকার বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন কর্মসূচীগুলোতে অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে এবং দেখাশোনা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আরামদায়ক অবসর নিশ্চিত করার জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ বাড়ি এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।

নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতার কাজগুলোর বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। নারীরা জাতি গঠনে একটি প্রধান শক্তি হয়ে উঠার সাথে সাথে পুরানো প্রথাগুলো ভেঙে দিয়েছে। এমন এক পর্যায়ে একাডেমিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত নারী মুক্তিযোদ্ধারা সারা বাংলাদেশের মেয়েদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, বাংলাদেশের নারী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পূর্ণদৈর্ঘ্য ফিচার ফিল্ম পরিণত করতে এগিয়ে আসা উচিত। একটি জাতির তাঁর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করার সর্বোত্তম উপায় হল তাদের স্মৃতিকে সর্বস্তরে ধরে রাখা এবং তাঁদের কল্পনা করে বাংলাদেশ গড়ার চেষ্টা করা।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গনে নারীরা যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা অনেক বড় ক্যানভাসের দাবিদার। উল্লেখ্য, তারামন বিবি এবং ক্যাপ্টেন ড. সিতারা বেগম শুধুমাত্র দুই নারী মুক্তিযোদ্ধা যারা দেশের চতুর্থ সর্বোচ্চ বীরত্ব পুরস্কার 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অন্যান্য নারী মুক্তিযোদ্ধারা যে সাহসিকতা, নারী সমাজকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যে সাংগঠনিক নৈপুণ্য স্থাপন করেছেন, তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তাঁদের কাছ থেকে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে তাঁরা নিমজ্জিত হয়। অনেকক্ষেত্রে, তাঁদের জাতি ভুলে গিয়েছে। তবুও, এই প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্ম জানুক যে, প্রতিটি যুগে নারী সমাজ ন্যায় ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে এবং তাকে অবশ্যই যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া এখন সময়ের দাবি। তিনি বীরাঙ্গনা নন। তিনি একজন সশস্ত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা।

তাই, বর্তমান জাতির দায়িত্ব একটি মসৃণ মালভূমিতে, গ্রামীণ এলাকার নারীদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের রেকর্ড রাখা। যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা করেছিল। বলা যায়, এই সকল নারী মুক্তিযোদ্ধা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারী ও পুরুষদের জন্য রোল মডেল হিসেবে কাজ করবে। তাঁদের আদর্শ ধারণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি সামনে এগিয়ে যেতে পারে, তবেই তাঁদের প্রতি আমাদের সম্মান জানানো হবে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎস:

১.১ দলিলপত্র ও অন্যান্য

- হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* (অষ্টম খন্ড), তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৪।
- হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র* (নবম খন্ড), তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২।
- হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র* (দ্বাদশ ও চতুর্দশ খন্ড), তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৪।
- রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১), ৩য় খণ্ড, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১২।
- আর্কাইভস থেকে প্রাপ্ত দলিলপত্র, অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমকালীন পত্র-পত্রিকা, সরকারি রিপোর্ট প্রভৃতি।
- Sheikh Hasina (edited), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,* Hakkany Publisher's, Dhaka, 2021.

১.২ সংবাদপত্র (দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক)

- প্রথম আলো
  - ০৮ মার্চ, ২০১২।
  - ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।
  - ১ আগষ্ট, ২০১৬।
  - ০৫ জুলাই ২০২১।

- The Daily Star
  - 30 June, 2009.
  - 22 July,2016.
  - 26 March, 2017.
  - 02December, 2018.
  - 01 December 2021.
- Bangladesh Observer
  - 28 September, 2003.
  - 01 August, 2016.
- The Independent
  - 21 July, 2016.
  - 3 December, 2018.
- https:// daily asian age.com, 22 July 2016.
- https:// observer bd.com, 01 August 2016.
- https:// www.dw.com, 12 February 2011.
- https:// www. Protidinersangbad.com, 7 December 2021.
- উইমেন নিউজ, ২৪
  - ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০।
  - ৩ এপ্রিল, ২০২১।
  - ১৫ মার্চ, ২০২১।
  - ১৭ মার্চ, ২০২১
- জাগো নিউজ ২৪.কম, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।
- ভোরের কাগজ
  - ০২ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।
  - ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।
  - ১০ ডিসেম্বর, ২০২০।
- দৈনিক জনকণ্ঠ

- ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
- ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৯।
- ২৭ মার্চ, ২০০৩।
- ২০ নভেম্বর ২০০৮।
- ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৯।
- ৪ মার্চ, ২০১৬।
- জুন, ২০২০।

❖ দৈনিক সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮

❖ প্রতিদিনের সংবাদ, ১০ মার্চ ২০২১।

❖ পূর্বদেশ, ১৪ জুন, ১৯৭২।

❖ বিজনেস বাংলাদেশ.কম, ৮সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

❖ দৈনিক সংবাদ, ৩ মার্চ, ১৯৭১।

❖ যায় যায় দিন, ২৫ এপ্রিল ২০২২।

❖ যুগান্তর

- ১ ডিসেম্বর, ২০১৮
- ২২ মার্চ ২০২১।

❖ দৈনিক আজাদি, ১ ডিসেম্বর, ২০২১।

❖ দৈনিক ইত্তেফাক, ১ ডিসেম্বর, ২০১৮।

❖ সময়ের আলো, ২২ মার্চ, ২০২১।

❖ সমকাল

- ৮ জানুয়ারি, ২০১৭।
- ১৭মে, ২০২০।
- ১ ডিসেম্বর, ২০২১।

১.৩ সাক্ষাৎকার

❖ *সাক্ষাৎকার:* কর্ণেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, স্থান: কলা ভবন, ইতিহাস বিভাগ, ঢা.বি., তারিখ: ৩০/০৩/২০২২, সময়: ১০.৩০- ১২.৩০। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল এবং লাবনী ইসলাম চুমকী।

❖ *সাক্ষাৎকার:* এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী), স্থান: সেগুনবাগিচা টাওয়ার, মগবাজার, ঢাকা, তারিখ: ০৩/০৬/২০২২, সময়: সন্ধ্যা ৭.১৫ থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মোঃ মামুন-অর-রশিদ।

❖ *সাক্ষাৎকার:* মো. আব্দুস সাত্তার (সহযোদ্ধা, তারামন বিবি), স্থান: কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম, তারিখ: ১৭/০৩/২০২২, সময়: ৩.০০ থেকে ৩.৪০, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী, মো. রকিবুল হাসান এবং মোঃ মামুন-অর-রশিদ।

❖ *সাক্ষাৎকার:* জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), স্থান: চ-২২, মহানন্দা বনানী, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা, তারিখ: ০৪/০৬/২০২২, সময়: বিকাল ৫.৩০ থেকে রাত ৯.৩০। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মোঃ মামুন-অর-রশিদ।

❖ *সাক্ষাৎকার:* আশালতা বৈদ্য (মুক্তিযুদ্ধের মহিলা কমান্ডার), স্থান: ২২/দিলকুশা/ সূর্যমুখী সংস্থা/ মতিঝিল, ঢাকা, তারিখ: ১২/০৩/২০২২ ,সময়: বিকাল ৪.২০ থেকে রাত ৭.৩০ পর্যন্ত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- প্রফেসর ড.মেসবাহ কামাল, মোঃ মামুন-অর-রশিদ এবং লাবনী ইসলাম চুমকী।

❖ *সাক্ষাৎকার:* মুক্তিযোদ্ধা ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, স্থান: ৬৮/এ, গ্রিনরোড, উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা, তারিখ: ১৬/০৪/২০২২, সময়: সকাল ১০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১.২০ ঘটিকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী।

❖ *সাক্ষাৎকার:* মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সোলায়মান মৃধা (হেমায়েত বাহিনীর গ্রুপ কমান্ডার), স্থান: গ্রাম-টুপুরিয়া, উপজেলা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালপঞ্জ, তারিখ: ০৫/০৩/২০২২, সময়: ১০.৩০-১১.১৫ পর্যন্ত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মোঃ মামুন-অর-রশিদ।

❖ *সাক্ষাৎকার:* মুক্তিযোদ্ধা প্রভাত রায় (সহযোদ্ধা: আশালতা বৈদ্য, স্বর্ণলতা রায়), স্থান: গ্রাম-রামশীল, উপজেলা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালপঞ্জ, তারিখ: ০৫/০৩/২০২২,সময়: ২.৩০-৩.২৫ পর্যন্ত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মোঃ মামুন-অর-রশিদ।

❖ *সাক্ষাৎকার:* মো. নাইমুদ্দিন নান্নু (বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিনের মেজ ছেলে), স্থান: গ্রাম-টুপুরিয়া, উপজেলা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালপঞ্জ, তারিখ: ০৫/০৩/২০২২, সময়: ১১.১৫-১২.৩০ পর্যন্ত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মোঃ মামুন-অর-রশিদ।

❖ *সাক্ষাৎকার:* মোঃ হাসিবুদ্দিন পান্নু (বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিনের বড় ছেলে), স্থান: গ্রাম-টুপুরিয়া, উপজেলা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালপঞ্জ, তারিখ: ০৫/০৩/২০২২, সময়: ১২.৩০-১.০০ পর্যন্ত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মোঃ মামুন-অর-রশিদ।

❖ *সাক্ষাৎকার:* মুক্তিযোদ্ধা ঊষা রাণী বৈদ্য, স্থান: গ্রাম- লাটেঙ্গা, উপজেলা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালপঞ্জ, তারিখ: ০৫/০৩/২০২২, সময়: ৪.০০-৫.১৫ পর্যন্ত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মোঃ মামুন-অর-রশিদ।

❖ *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* বিথীকা বিশ্বাস, সংগ্রাহক: শারমীন মুর্শিদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর, ২০০০।

❖ *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* ক্যাপ্টেন বেগ, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আলতাফ হোসেন (সেক্টর ৯-এর কমিউনিকেশন অফিসার), ওবায়দুর রহমান মুস্তফা (সেক্টর ৯-এর স্টাফ অফিসার), মুক্তিযোদ্ধা তোফাজ্জল হক, পরিমল ঘোষ এবং বুলু, সংগ্রাহক : শারমীন মুর্শিদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর, ২০০০।

❖ *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: কাঁকন বিবি, সংগ্রাহক: ঢাকা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (RDC), ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬।

❖ *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার (ভিডিও চিত্র):* কাঁকন বিবি, লক্ষীপুর, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ, সংগ্রাহক: 1971 archive.org, 26 January, 2017.

❖ *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: কাঁকন বিবি, সংগ্রাহক: শামীমা নাসরিন, ০৪ আগস্ট, ২০১৩।

❖ *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার:* মুক্তিযোদ্ধা করুনা বেগম, মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা মানিক, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ কুতুব উদ্দিন আহমেদ, জনাব ইসমত আরা, সংগ্রাহক: লে. কর্ণেল (অব.) হারুন অর রশিদ (বীরপ্রতীক)।

❖ *সংগৃহিত সাক্ষাৎকার*: শিরিন বানু মিতিল, জার্মান রেডিও সাংবাদিক ডয়েচ ভ্যালির কাছে প্রদেয়, সংগ্রাহক: জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে)।

২. দ্বৈতয়িক উৎস:

২.১ পি.এইচ.ডি ও এম.ফিল অভিসন্দর্ভ

❖ শামীমা নাসরীন, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ: পাঁচটি কেস-স্ট্যাডি (১৯৫২-১৯৯৪)*, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০১৬।

❖ রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-১৯৪৭)*, পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০১৪।

❖ বীনা রানী রায়, *বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী (১৯৪৭-১৯৭১)*, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।

❖ সোনিয়া নিশাত আমিন, *উপনিবেশিক বাংলায় মুসলিম নারী জগৎ*, পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

২.২ কোষ গ্রন্থ

- সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া (১-১৪ খণ্ড)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২।
- মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধকোষ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫।
- হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ (১০ খণ্ড)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০২১।

২.৩ বাংলা গ্রন্থ

- অধ্যাপক মমতাজ বেগম এবং মফিদা বেগম, *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮।
- অধ্যাপক শাহানা পারভীন লাভলী, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ইতি প্রকাশন, বাংলাদেশ, ২০২১।
- অদিতি ফাল্গুনি, *বাংলার নারী সংগ্রামী: ঐতিহ্যের অনুসন্ধান*, স্টেপস টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭।
- আনিসুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।
- আনোয়ার পাশা, *রাইফেল রোটি আওরাত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
- আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ বিতান, ঢাকা, ১৯৬৮।
- আয়সা খানম, *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০০১।
- আসাদুজ্জামান আসাদ, *একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬।
- আল আজাদ, *একাত্তরের সিলেট অন্যরকম যুদ্ধ*, আদৃতা প্রকাশনী, সিলেট, ১৯৯৮।
- আ.শ.ম. বাবর আলী, *একাত্তরের নারী মুক্তিযোদ্ধা*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০১০।
- এ.এস.এম. সামসুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৫।

❖ এইচ.টি.ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪।

❖ কবীর মুজিব মেহেদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ২০০৬।

❖ কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১৭।

❖ জান্নাত-এ-ফেরদৌসি, *বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১।

❖ জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।

❖ জোবায়েদা নাসরিন, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য নারী*, শব্দশৈলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

❖ জোবায়েদা নাসরিন, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ নারী*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

❖ তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের যুদ্ধকথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

❖ তাজুল মোহাম্মদ, *নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি (বীরপ্রতীক)*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯।

❖ তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের গাঁথা*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩।

❖ ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্রিপ ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯।

❖ ড.মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯।

❖ ড. এম এ হাসান, *যুদ্ধ এবং নারী*, জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্ট্যাডিস সেন্টার, ঢাকা, ২০০৬।

❖ ডাঃ বদরুন নাহার খান, *মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান*, জয়বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৯।

❖ দে, তপন কুমার, *মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজ*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

❖ নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (অখন্ড), জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।

❖ পান্না কায়সার, *মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

❖ ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯১।

❖ ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯।

❖ ফজলুল বারী (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা এবং জন্মভূমি প্রসঙ্গ*, সংযোগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।

❖ বদরুদ্দিন ওমর, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০০।

❖ বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান, *গেরিলা নারী: নারী মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা।

❖ বেগম মুশতারী শফী, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, প্রিয়ম প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯২।

❖ বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯।

❖ *মতিউর রহমান, একাত্তরের বীরযোদ্ধা: খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩।

❖ মহিউদ্দিন আহমদ(সম্পাদিত), *আমাদের একাত্তর*, সিডিএল, ঢাকা, ২০০৬।

❖ মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮।

❖ মালেকা বেগম, *নূরজাহান মুরশিদের সাক্ষাৎকার*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

❖ মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৪।

❖ মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯০।

❖ মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *একাত্তরের বিজয় গাঁথা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

❖ মুসা সাদিক, *মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম*, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, ১৯৯৫।

❖ মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থিদের ভূমিকা (প্রথম খন্ড)*, গণ প্রকাশনী, ২০০১।

❖ মেসবাহ কামাল, জান্নাত-এ-ফেরদৌসি, *অশ্রু-সাগরে মিলিত প্রাণ: মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা-জনগোষ্ঠী*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২।

❖ মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়া, *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১।

❖ মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ২০০০।

❖ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ নারী*, আর্শীবাদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫।

❖ রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা, আইইডি, ২০০৬।

❖ রশীদ হায়দার (সম্পাদিত), *স্মৃতি ১৯৭১* (চতুর্থ খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১।

❖ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ: প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৮।

❖ রীটা আশরাফ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনলো যাঁরা*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।

❖ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *স্ত্রী জাতির অবনতি: মতিচুর, রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩।

❖ লুৎফর রহমান রিটন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

❖ লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *দেশটাকে ভালোবেসে-৪*, শুধুই মুক্তিযুদ্ধ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ-১০।

❖ শওকত আরা হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

❖ শাহীন আক্তার (সম্পাদিত), *নারীর একাত্তর ও যুদ্ধ পরবর্তী কথ্য কাহিনী*, আইন শালিশ কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০১।

❖ শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, ঘাতক দালাল নিমূল কমিটি, ঢাকা, ১৯৯৯।

❖ সায়মা খাতুন, 'নারীবাদী ইতিহাস রচনার সঙ্কট', বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৪ বিশেষ সংখ্যা: বাংলাদেশের বহুকণ্ঠ, নভেম্বর, ১৯৯৯।

❖ সেলিনা হোসেন, অজয় দাশগুপ্ত ও রোকেয়া কবীর (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে* (প্রথম খন্ড), বাংলার নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৮।

❖ সাখাওয়াত হোসেন মজনু, *রণাঙ্গনে সূর্য সৈনিক*, প্রকাশক: মর্জিনা আখতার, চট্টগ্রাম, ১৯৯২।

❖ সাইদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতা বিধান*, বাংলাদেশ লোক সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৮।

❖ সাহিদা বেগম, *যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬।

❖ সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

❖ সুরাইয়া বেগম, *নারী মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ: অন্তর্লোকে অন্বেষণ*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২।

❖ সেলিনা হোসেন, *একাত্তরের ঢাকা*, আহমদ পাবিলিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৯।

❖ সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙ্গালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন (১৮৮৬-১৯৩৯)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২।

২.৪ ইংরেজি গ্রন্থ

❖ Ali, Rao F, *How Pakistan Got Devided*, Jang Publication, Lahore, 1992.

❖ Blood, Archer K, *The Cruel Birth of Bangladesh, Memories of an American Diplomat*, UPL, Dhaka, 2006.

❖ Bass, Garry J, *The Blood Telegram: Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide,* Alfred A. Knoph, New York, 2013.

❖ E. Cary, *The Roman Antiquities*, Harverd University press, Cambridge, Mass. 1: 381-382.

❖ Hossain kamal, *Bangladesh: Quest For Freedom and Justice*,UPL, Dhaka, 2006.

❖ Hossain, T & Tapas Shaha, *Struggle For Freedom*, Tarun Printers, Calcutta, 1973.

❖ Joan Kelly, `The social Relation of the Sexes: Methodological Implications of Women's History,' Catharine R. Stimpson (ed), *Women, History and Theory: The Essays of Joan Kelly*, The University of Chicago Press, Chicago and London ,1986.

❖ K C Shaha, `The Genocide of 1971 and the Refugee Influx in the East', Ranabir Samaddar (ed.), *Refugee and the State: Practice of Asylum and Care in India 1947-2000*, New Delhi, Sage Publication, India, 2003.

❖ Michel Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, *Women, Culture and Society*, Stanford University Press, Stanford, Calif. 1974.

❖ Ruth Kelso, *The Civilization of the Rennaissance in Italy*, phaidon press, London,1950.

মানচিত্র-১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি।

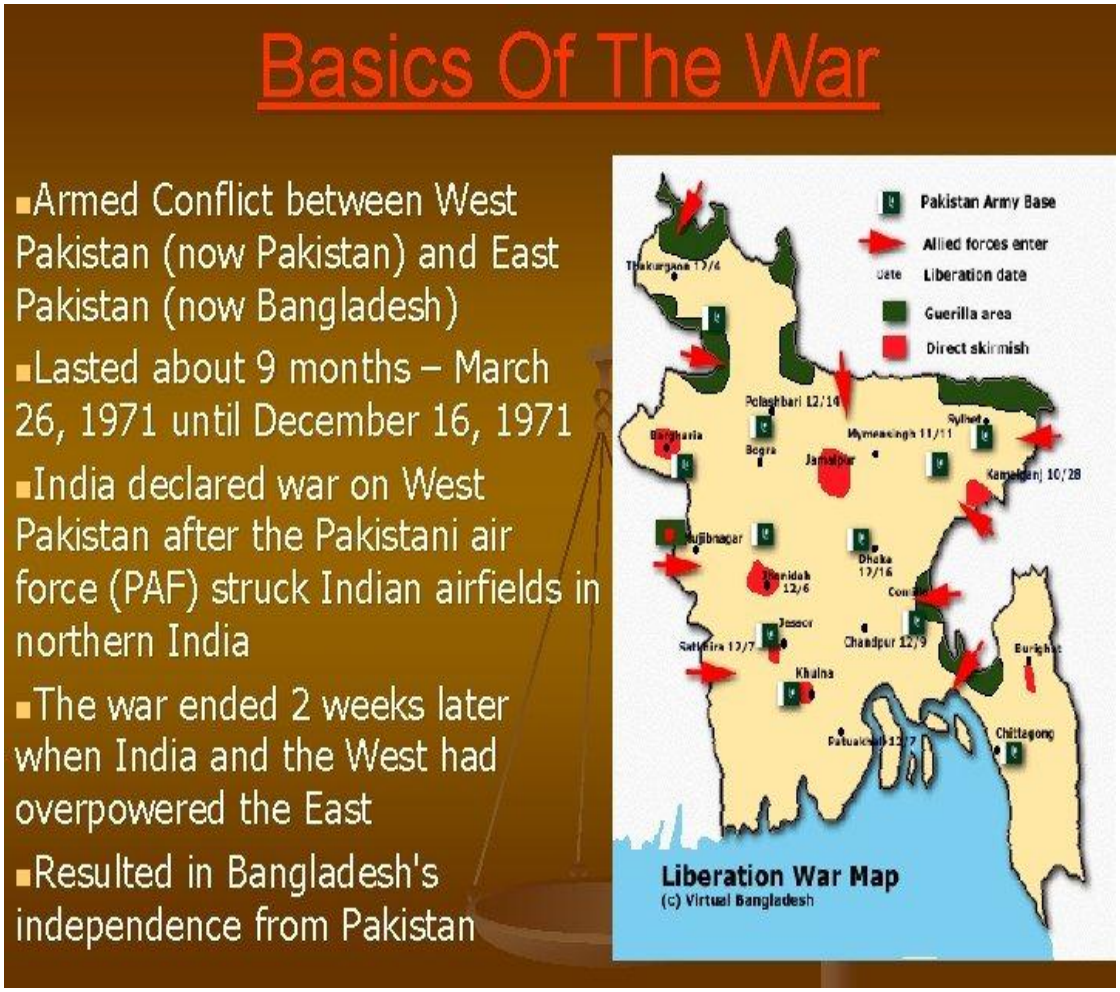

Source: Slide to Doc.Com

মানচিত্রঃ ২

১৯৭১ সালের অপারেশন সার্চলাইটে বাঙালি এবং
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান।

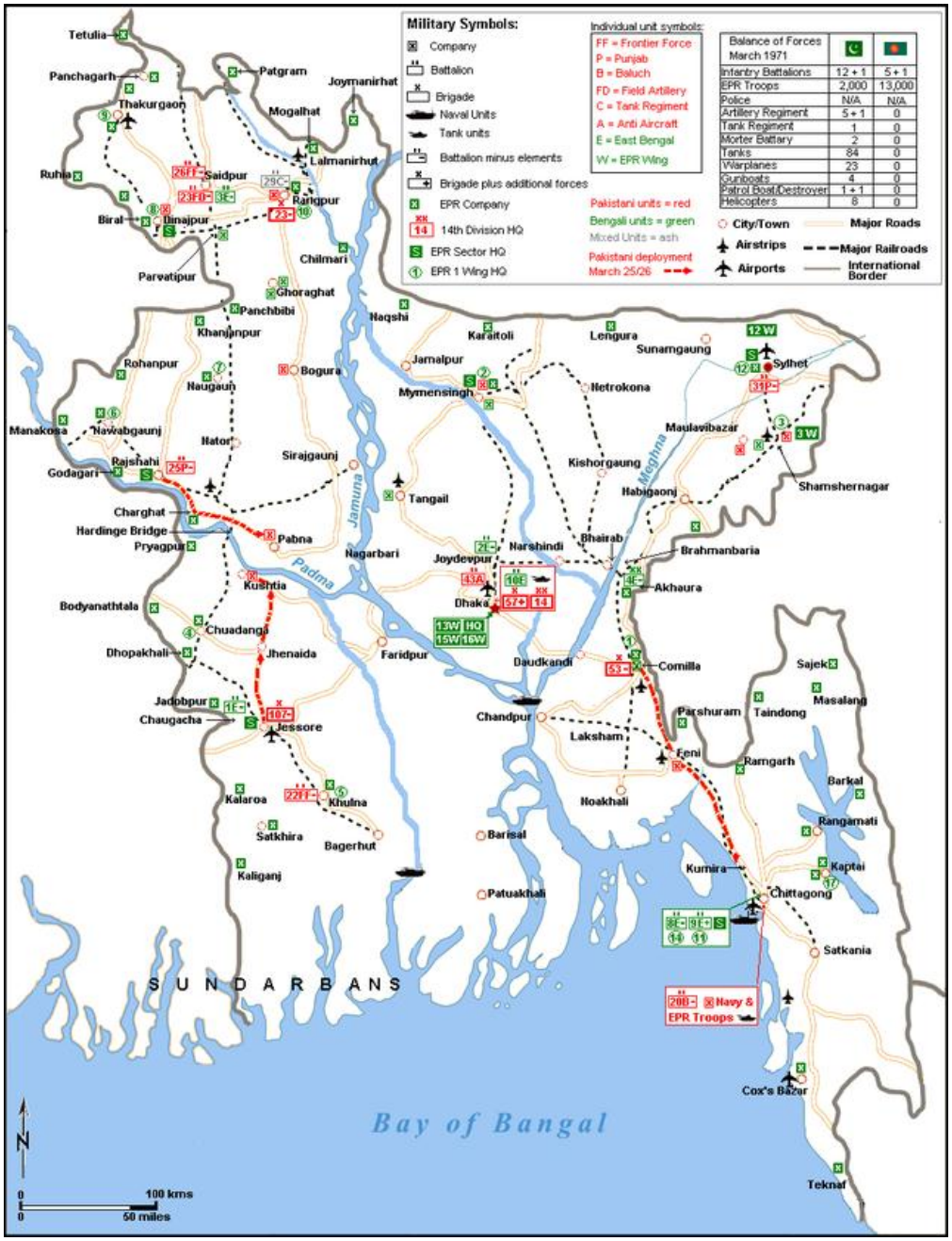

Source: https://military-history.fandom.com

মানচিত্র-৩

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অবস্থান

'অপারেশন জ্যাকপট'।

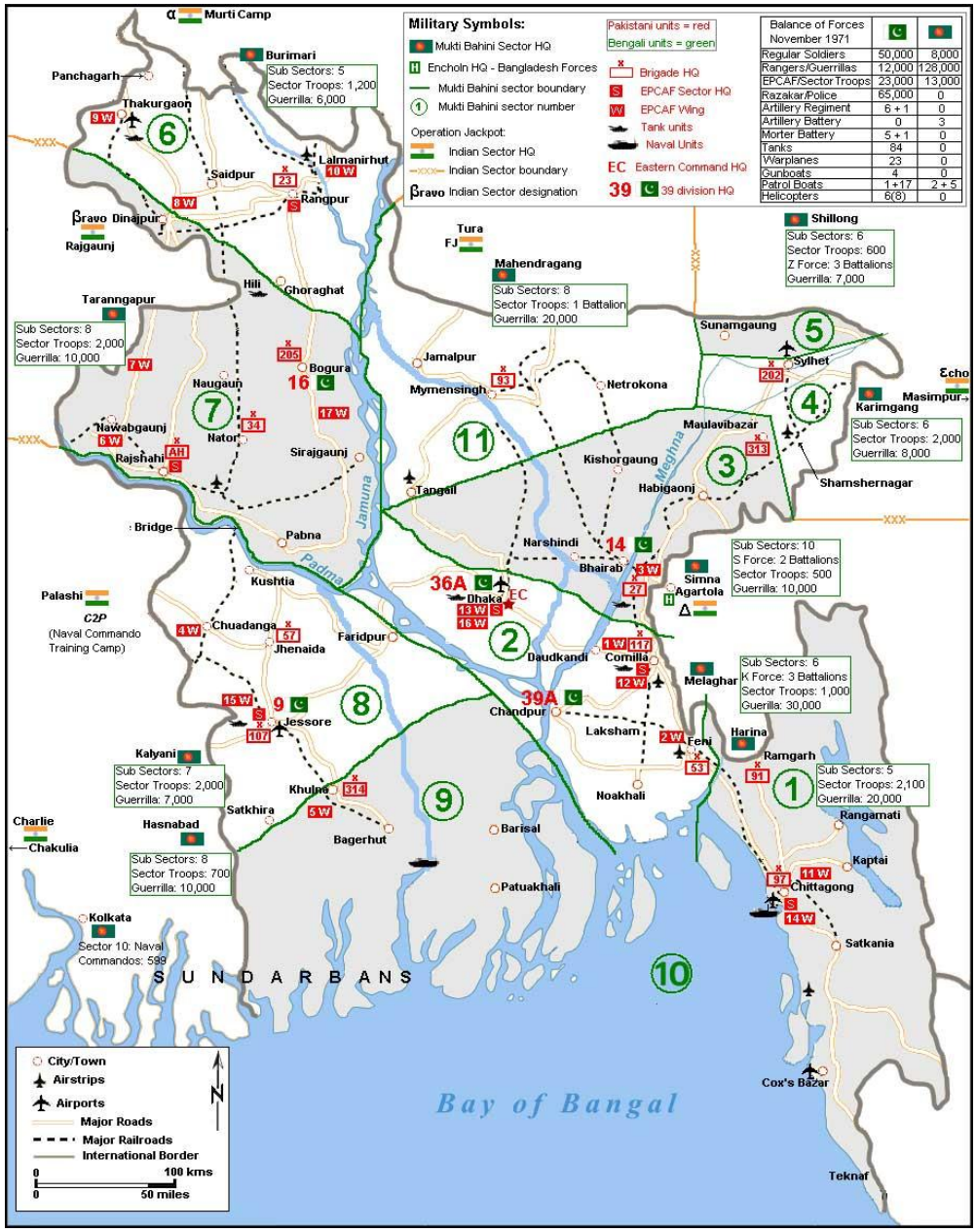

Source: https://military-history.fandom.com

মানচিত্র-৪

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবস্থান।

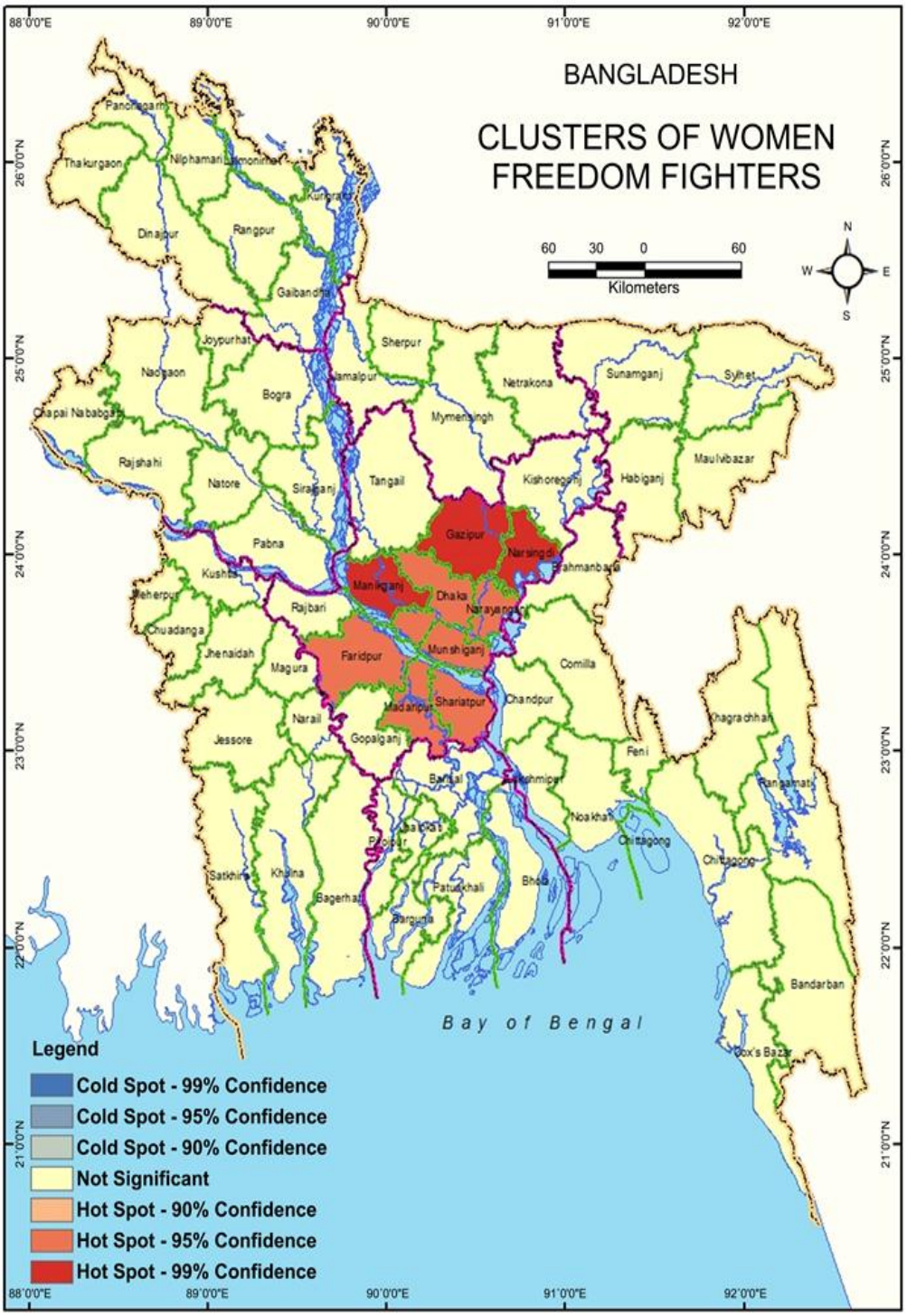

Hot-spot analysis of the location of women liberation warriors of the Liberation War 1971

Source: scirp.org

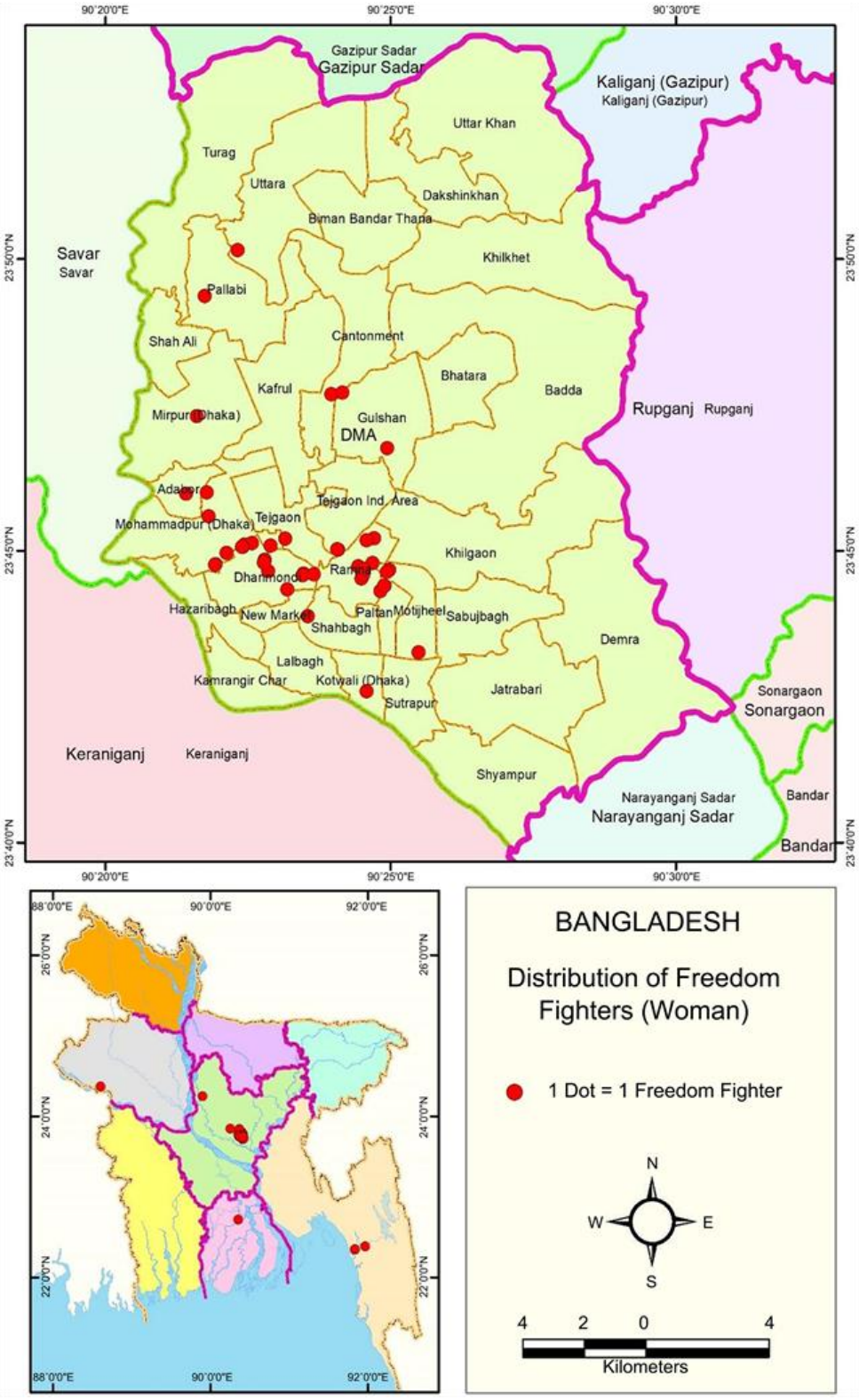

Distribution of woman liberation warriors during the liberation war 1971
Source: scirp.org

মানচিত্রঃ ৫

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের ১১ টি সেক্টর।

Source: Sites.google.com

মানচিত্র:৬

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান সামরিক ইউনিট এবং মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধ।

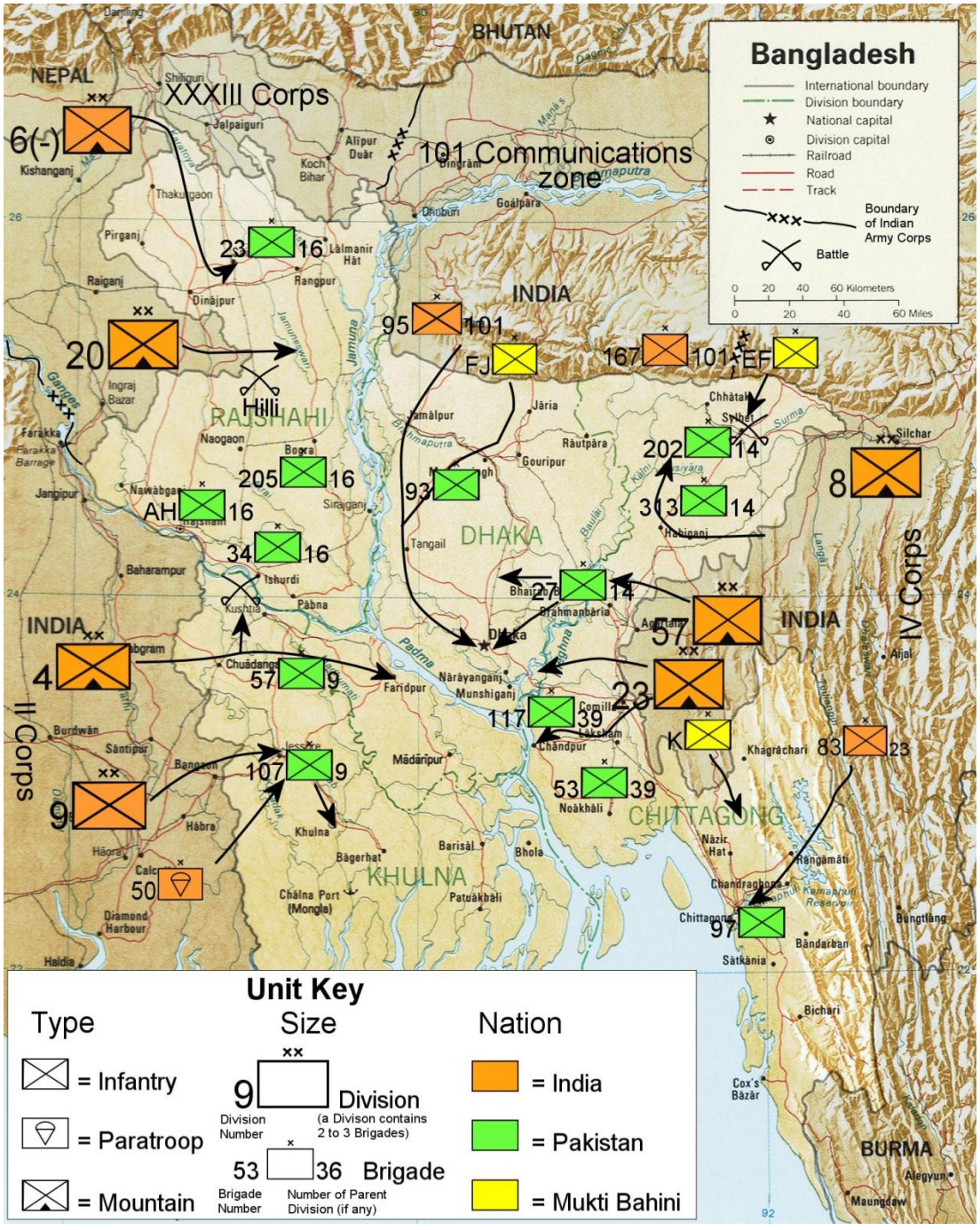

Source: wikipedia commons, the free media repository.

সারণি-১ঃ

সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র

নাম	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা	জেলা	সেক্টর/নেতৃত্ব	প্রশিক্ষণ	সময়কাল
তারামন বিবি	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	কুড়িগ্রাম	আবু তাহের-এর নেতৃত্বাধীন ১১-নং সেক্টর	মুহিব হাবিলদারের কাছে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (৯ মাস)
কাঁকন বিবি	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	সুনামগঞ্জ	কমান্ডার মীর শওকত আলী-এর নেতৃত্বাধীন ৫- নং সেক্টর	সহযোদ্ধাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (আগস্ট-ডিসেম্বর)
শিরিন বানু মিতিল	পাবনা জেলার ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি	পাবনা	মেজর জলিল-এর নেতৃত্বাধীন ১১ নং সেক্টর	গোবরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (এপ্রিল-ডিসেম্বর)
আশালতা বৈদ্য	বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে অনুপ্রাণিত	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)

স্বর্ণলতা ফলিয়া	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)
প্রিনছা খেঁ	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	টেকনাফ	বাউখাঠি ক্যাম্পে স্বীয় প্রতিরোধ	পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কৌশলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন
সুষমা হাজরা	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)
পুষ্প রাণি বাড়ুই	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)
কুসুম বাগচী	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)
সুরমা রাণি বাড়ুই	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)

মিনতি বিশ্বাস	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)
অনিতা বিশ্বাস	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)
কনক লতা ফলিয়া	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)
উৎপলা বণিক (ঊঝা)	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)
স্বর্ণলতা রায়	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন	হেরেরকান্দি ও লেবুরবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে - ডিসেম্বর)

আলমতাজ বেগম ছবি	সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী	ঝালকাঠি	সিরাজ সিকদার-এর নেতৃত্বাধীন ১১ নং সেক্টর	গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন
বিথীকা বিশ্বাস	বরিশালের চাখার ফজলুল হক কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী	বরিশাল	৯ নং সেক্টর	গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (আগস্ট-ডিসেম্বর)
শিশির কনা দত্ত	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	পিরোজপুর	৯ নং সেক্টর	গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (আগস্ট-ডিসেম্বর)
শাহানা পারভীন শোভা	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	বরিশাল	সিরাজ সিকদার-এর নেতৃত্বাধীন ১১ নং সেক্টর	সিরাজ সিকদারের কাছে ভারী অস্ত্র চালনা শিক্ষা	মুক্তিযুদ্ধকালীন (আগস্ট-ডিসেম্বর)
হালিমা খাতুন	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	বাগেরহাট	৯ নং সেক্টর	কমান্ডার তাজুল ইসলামের কাছে অস্ত্র চালনা শিক্ষা	মুক্তিযুদ্ধকালীন (আগস্ট-ডিসেম্বর)

হালিমা পারভীন	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	যশোর	৮ নং সেক্টর	কমান্ডার আকমল হোসেনের কাছে অস্ত্র চালনা শিক্ষা	মুক্তিযুদ্ধকালীন
করুনা বেগম	মুক্তিযোদ্ধা	বরিশাল	৯ নং সেক্টর	কমান্ডার কুতুবদ্দিন -এর কাছে অস্ত্র চালনা শিক্ষা	মুক্তিযুদ্ধকালীন
আলেয়া বেগম	মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আলমডাঙ্গা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত	চুয়াডাঙ্গা	৮ নং সেক্টর	ভারতের বাঙ্গালজি চাপড়া ক্যাম্পে অস্ত্র চালনা শিক্ষা	মুক্তিযুদ্ধকালীন (আগস্ট-ডিসেম্বর)
রওশন আরা	তথ্য নেই	ঢাকা	তথ্য নেই	তথ্য নেই	মুক্তিযুদ্ধকালীন
মিনু রাণি দাস	ছাত্রলীগ কর্মী	চট্টগ্রাম	১ নং সেক্টর	কমান্ডার নুরুল আলম মন্টু ও গ্রুপ কমান্ডার নুরউদ্দিনচৌধুরী-এর কাছে অস্ত্র চালনা শিক্ষা	মুক্তিযুদ্ধকালীন

বকুল মোস্তফা	ছাত্রলীগ কর্মী	কুমিল্লা	তথ্য নেই	লেম্বুছড়া ক্যাম্পে ও আগরতলায় স্পেশাল স্কোয়াডের কাছে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন
ফরিদা খানম সাকী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী	নোয়াখালী	ছাত্রলীগের সভাপতি বি এল এফ-এর সদস্য মনিরুল হকের নেতৃত্বাধীন	আগরতলায় মেজর শর্মা ও কে.বি. সিং-এর কাছে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মার্চ- ডিসেম্বর)
সালেহা বেগম	সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী	যশোর	৯ নং সেক্টর	ক্যাপ্টেন জাহিদ কর্তৃক প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মার্চ- ডিসেম্বর)
মিরাসি বেগম	তথ্য নেই	বরিশাল	তথ্য নেই	কমান্ডার বাচ্চুমিয়া কর্তৃক প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মার্চ- ডিসেম্বর)
মনোয়ারা বেগম (মনু)	বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত	পটুয়াখালি	৯ নং সেক্টর	শরুখোলা ক্যাম্পে মেজর-জিয়াউদ্দিনের এর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (এপ্রিল- ডিসেম্বর)

কাঞ্চন মালা	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	মুন্সিগঞ্জ	তথ্য নেই	ভারতের তুরা ক্যাম্পে, টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালন
মেহেরুন্নেসা মেরী	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	গোপালগঞ্জ	৮নং সেক্টর	ওড়াকান্দি ধাম ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (আগস্ট-ডিসেম্বর)
পেয়ার চাঁদ	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	সুনামগঞ্জ	তথ্য নেই	মেজর মোতালেবের কাছে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন
আনোয়ারা বেগম (আনু)	বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত	পটুয়াখালী	৯ নং সেক্টর	মেজর জিয়াউদ্দিনের কাছে গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (এপ্রিল- ডিসেম্বর)
ছায়ারুন	রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না	সিলেট	তথ্য নেই	কমান্ডার মাহবুবহোসেন খায়েরের কাছে প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে-ডিসেম্বর)

মোমেলা বেগম	বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও পারিবারিকভাবে অনুপ্রাণিত	গোপালগঞ্জ	হেমায়েত বাহিনীর অধীনে	ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিনের কাছে অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ	মুক্তিযুদ্ধকালীন (মে-ডিসেম্বর)

উৎস: নারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিতরণ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
https://www.malwa.gov.bd
এবং
গবেষক কর্তৃক নিজ উদ্যোগে সংগৃহিত।

পরিশিষ্ট-১

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন স্থিরচিত্র

চিত্র- ১: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নারীদের সমাবেশ।

উৎস: বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০।

উৎস: The Daily Star, 16 December, 2016.

উৎস: মুনতাসীর মামুন, মুক্তিযুদ্ধ কোষ (পঞ্চম খন্ড), সময় প্রকাশন, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৪।

উৎস: জাগো নিউজ ২৪.কম, ১ ডিসেম্বর ২০১৮।

উৎস: সমকাল, ২১ মার্চ, ২০২১।

চিত্র-২: বিজয় ধ্বনিতে আজো বাজে নারী গেরিলা পদধ্বনি।

পরিশিষ্ট-২

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লিখিত পুরুষ ছদ্মবেশে নারী মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহত করুনা বেগমের প্রতি অভিনন্দন পত্র

শেখ মুজিবুর রহমান

(শেখ মুজিবুর রহমান)

উৎস: কর্ণেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক) কর্তৃক সংগৃহিত।

আরো দেখুন: The Daily Star, 26 March, 2012.

পরিশিষ্ট-৩

সাক্ষাৎকার স্থান ও সাক্ষাৎকার পর্বের স্থিরচিত্র

চিত্র: প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল, কর্ণেল সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক) এবং গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী
সাক্ষাৎকার: কর্ণেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, স্থান- কলা ভবন, ইতিহাস বিভাগ, ঢা.বি., তারিখ-৩০/০৩/২০২২,
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- প্রফেসর ড.মেসবাহ কামাল এবং গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী।

চিত্র: জনাব আরমা দত্ত (এম.পি) এবং গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী।
সাক্ষাৎকার: এম.পি. আরমা দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী), স্থান-সেঞ্চুরি টাওয়ার, মগবাজার, ঢাকা, তারিখ: ০৩/০৬/২০২২,
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মো. মামুন-অর-রশিদ।

চিত্রঃ প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য এবং গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী
*সাক্ষাৎকার:*আশালতা বৈদ্য (মুক্তিযুদ্ধের মহিলা কমান্ডার), স্থান: ২২/দিলকুশা/ সূর্যমুখী সংস্থা/ মতিঝিল, ঢাকা।
তারিখ: ১২/০৩/২০২২ , সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- প্রফেসর ড.মেসবাহ কামাল, গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মো. মামুন-অর-রশিদ।

চিত্র: মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাকারী ঊষা রাণী বৈদ্য (মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্যের তৃতীয় বোন) এবং গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী।
সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাকার ঊষা রাণী বৈদ্য (মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্যের তৃতীয় বোন),
স্থান: গ্রাম- লাটেঙ্গা, উপজেলা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালপঞ্জ। তারিখ: ০৫/০৩/২০২২,
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মো. মামুন-অর-রশিদ।

চিত্রঃ মুক্তিযোদ্ধা মো: সোলায়মান মৃধা, মো: নাইমুদ্দিন নান্নু (বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিনের মেঝ ছেলে) এবং গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী।
সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা মো. সোলায়মান মৃধা (হেমায়েত বাহিনীর গ্রুপ কমান্ডার), স্থান: গ্রাম- টুপুরিয়া, উপজেলা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালপঞ্জ, তারিখ: ০৫/০৩/২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মো. মামুন-অর-রশিদ।

চিত্র ঃ মিসেস জয়া তাসনিম রহমান
সাক্ষাৎকার: মিসেস জয়া তাসনিম রহমান (শিরিন বানু মিতিলের বড় মেয়ে), চ-২২, মহানন্দা বনানী, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। তারিখ: ০৪/০৬/২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী এবং মো. মামুন-অর-রশিদ।

চিত্র ঃ মুক্তিযোদ্ধা ড. এস এম আনোয়ার বেগম।

সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা ড. এস এম আনোয়ারা বেগম, ১৬৮/এ, গ্রিনরোড, উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা, তারিখ: ১৬/০৪/২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী।

চিত্র: মো. আব্দুস সাত্তার

সাক্ষাৎকার: মো. আব্দুস সাত্তার (সহযোদ্ধা, তারামন বিবি), স্থান: কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম, তারিখ: ১৭/০৩/২০২২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- গবেষক লাবনী ইসলাম চুমকী, মো. মামুন-অর-রশিদ এবং মো. রকিবুল ইসলাম।

পরিশিষ্ট-৪

মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি (বীরপ্রতীক) সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে তারাসন বিবির বীরপ্রতীক পদক গ্রহণ, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

চিত্র: সরকার প্রদত্ত তারামন বিবির বাড়ি এবং তারামন বিবি সড়ক।

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত।

চিত্র: তারামন বিবি পাঠাগার, চর রাজিবপুর, রংপুর।

চিত্র: তারামন বিবি, বীরপ্রতীক হল, বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, সৈয়দপুর, রংপুর।

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত।

পরিশিষ্ট-৫

মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র

Source: The Daily Star, 23 march, 2018

সাময়িক সনদপত্র

সূত্র: জাগো নিউজ ২৪.কম, ২৪ মার্চ, ২০১৮।

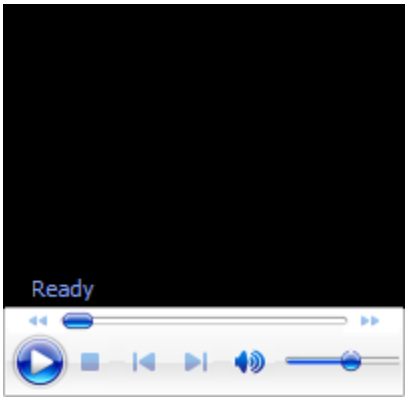

কাঁকন বিবি সম্পর্কিত ভিডিও চিত্র, লক্ষীপুর, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
Source: 1971 archive.org, 26 January, 2017.

পরিশিষ্ট-৬

মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র

চিত্র: মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল, তপতী দাস ও আরমা দত্ত (এম.পি)

চিত্রঃ মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল।

চিত্র: মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল, ছেলে- তাহসিনুর রহমান, মেয়ে- জয়া তাসনিম রহমান এবং তন্বী নওশীন

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত।

চিত্র: মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল স্মরণে মিতিল ব্লক, ছাত্রী রেসিডেন্সিয়াল, চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমী

চিত্র: মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল স্মরণে শিরিন বানু মিতিল সড়ক, পাবনা।

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিরচিত্র

চিত্র: আশালতা বৈদ্য ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মো.জিল্লু রহমান

চিত্র: আশালতা বৈদ্য ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর

চিত্র: আশালতা বৈদ্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত।

চিত্র: আশালতা বৈদ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়

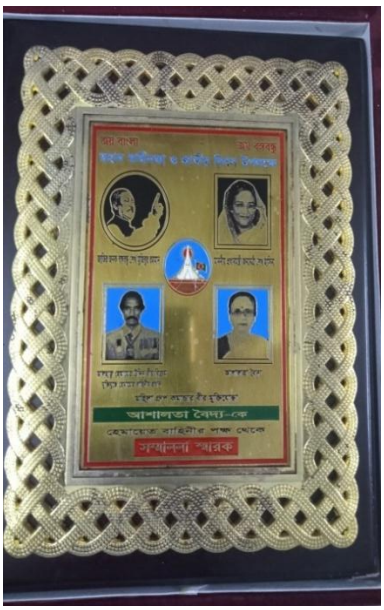

চিত্র: হেমায়েত বাহিনীর পক্ষ থেকে আশালতা বৈদ্য গ্রুপ কমান্ডার স্বীকৃতি।

চিত্র: মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ থেকে আশালতা বৈদ্য গ্রুপ কমান্ডার স্বীকৃতি;

চিত্র:আশালতা বৈদ্য মাদার তেরেসা পদক লাভ, ২০১৬।

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অন্যান্য স্থিরচিত্র

চিত্র: বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিন স্মরণে হেমায়েত বাহিনীর স্মৃতি যাদুঘর, টুপুরিয়া, গোপালগঞ্জ।

চিত্র ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তোলা ছবি (টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ)।

Dhaka University Institutional Repository

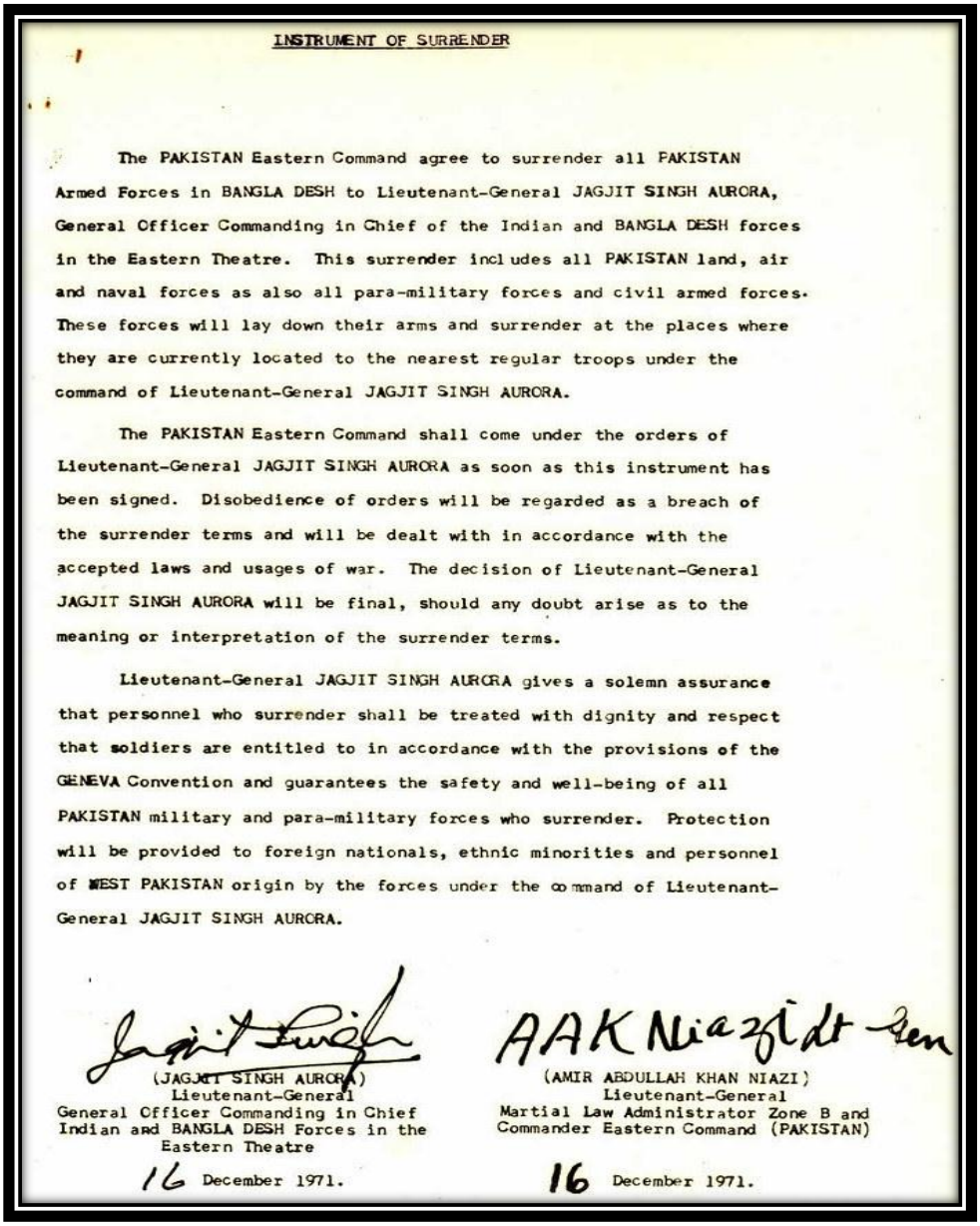

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

চিত্রঃ আত্মসম্পর্ণের ডকুমেন্টস

Source: origins.osu.edu

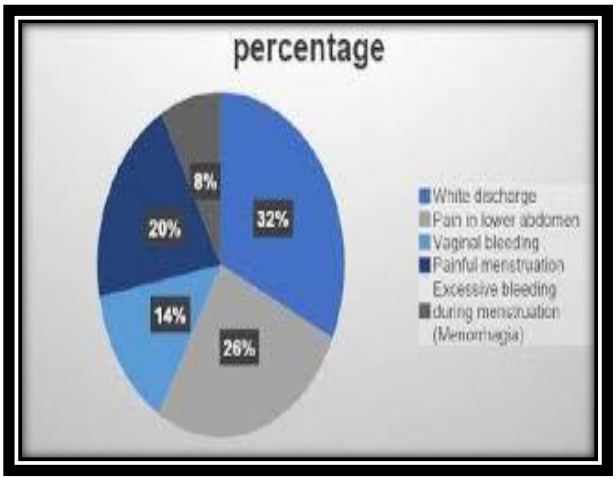

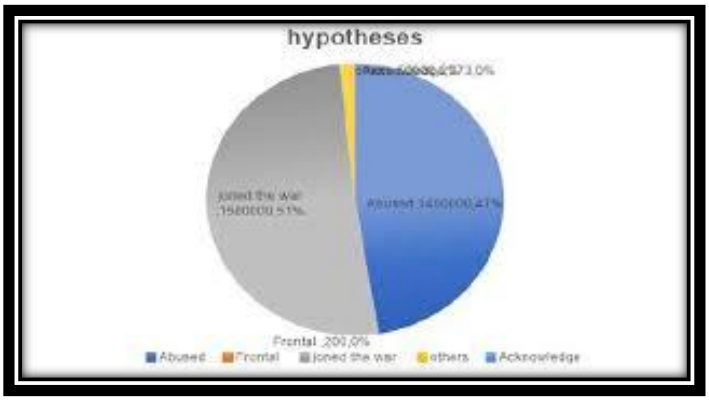

পাই চিত্রঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ।

Source: War Crime Facts Finding Committee